প্রতীচী ও শিশুশিক্ষা

শিক্ষকের দৃষ্টিতে ও সৃষ্টিতে

প্রতীচী (ইন্ডিয়া) ট্রাস্ট

অভিযাত্রী ও শিশুশিক্ষা

শিক্ষকের দৃষ্টিতে ও সৃষ্টিতে

প্রতীচী (ইন্ডিয়া) ট্রাস্ট

অতিমারি ও শিশুশিক্ষা

মার্চ ২০২১

প্রকাশক
প্রতীচী ইন্সটিটিউট
প্রতীচী (ইন্ডিয়া) ট্রাস্ট
আই বি ১৪, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০১০৬

টেক মাহিন্দ্রা ফাউন্ডেশন
হরিজন সেবক সঙ্ঘ, গান্ধী আশ্রম, কিঙ্গসওয়ে ক্যাম্প
নয়া দিল্লি-১১০০০৯

প্রচ্ছদ
অলিম্পিয়া বড়ুয়া
শেখ বুলবুল
উর্বা চৌধুরী
তরুণকান্তি বারিক

মুদ্রক
সৃজনী, কলকাতা ৭০০০৫৬

সূচিপত্র

গোড়ার কথা ০৭
মানবী মজুমদার ও সাবির আহমেদ

ছাত্ররা কোথায়, কেমন আছে, অতিমারির কালবেলায়?
আলাপে শিক্ষকরা ও প্রতীচী ১৫
উর্বা চৌধুরী

ঘুম ভাঙার পর ২৩
শুচিব্রত গুপ্ত

ভাইরাস, অতিমারি, স্যানিটাইজার...
নতুন শেখা শব্দ ও দূর-শিখন ২৮
কাকলি দাস দে

শিশুশিক্ষার অনুশীলনঃ
ফুটপাতে, রেল লাইনের ধারে, গঙ্গার ঘাটে ৪১
অলিম্পিয়া বড়ুয়া

সংকটকালে নতুন দিশা ৪৮
বর্ণালী সেনগুপ্ত

যখন ছাত্ররা স্কুলে ফিরবে ৫২
দীপক রায়

জাতীয় শিক্ষানীতি (২০২০)-র ফাঁকফোঁকর ৫৭
সুতপা ঘোষ

বিশেষ চাহিদার শিশুকে ভুলিনি ৬১
গার্গী ভট্টাচার্য

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ঃ কিছু ভীতিপ্রদ ইশারা ৬৫
শৈবাল বসু

কৃতজ্ঞতা

লকডাউনের বেড়াজাল ছিল; তার মধ্যেই ছিল শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার একান্ত তাগিদ। অতিমারির ক্রান্তিকালেও ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার ও সার্বিক বিকাশের প্রচেষ্টা যাতে সম্পূর্ণ স্তব্ধ না হয়ে যায় সেই বিষয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনার নিবিড় আগ্রহ ছিল প্রতীচীর দিক থেকে। এই বিষয়ে তাঁদের ভাবনা ও গঠনমূলক প্রয়াসের একটি দলিল তৈরি করা প্রতীচীর কাছে একটা সামাজিক সেতুবন্ধনের কাজ হিসাবে দেখা দিল। সঙ্গে পাওয়া গেল টেক মহেন্দ্র ফাউনডেশনকে। ধারাবাহিকভাবে সহযোগিতা করেছেন কলকাতা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতি শ্রীকার্তিক চন্দ্র মান্না এবং সমগ্র শিক্ষা মিশন, কলকাতা জেলার কনসালট্যান্ট শ্রীসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এগিয়ে এলেন সংসদের অন্তর্গত বেশ কিছু স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, শুরু হল নিয়মিত অন্তরজাল সভা। এই সভাগুলিতে অংশগ্রহণ করার জন্য সময় দিয়ে, প্রতীচীকে তাঁদের ভাবনার অংশীদার করে, এবং নিজেদের ভাষ্য লিপিবদ্ধ করে শিক্ষক, শিক্ষিকারা প্রতীচীর এই প্রয়াসকে রূপায়িত করবার ব্যাপারে যে অশেষ সাহায্য করেছেন তার জন্য প্রতীচী বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। প্রতীচীর অন্দরমহলে অনেকের উৎসাহ আর পরিশ্রমে কাজটি এগিয়েছে। এই সংকলনের পরিকল্পনা থেকে রূপায়নের প্রতিটি ধাপে মূল্যবান মতামত ও স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন অন্তরা দেব সেন ও দিলীপ ঘোষ। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন প্রতীচীর বাকি সবাই। অঙ্কিতা মুখার্জি আর শিবা আমীর শিক্ষক-প্রতীচী অন্তরজাল সভা আয়োজনে সতত তৎপর থেকেছেন বলেই অতিমারির বেড়াজাল সত্ত্বেও পরস্পরের মধ্যে কথার জাল বোনা গেছে, তারই ফসল এই সংকলনটি।

প্রতীচী টিম
কলকাতা
২০২১

গোড়ার কথা

মানবী মজুমদার ও সাবির আহমেদ

‘মাস্টারমশায় তুমি কি আর আসবে না? স্কুল কি আর কোনওদিন খুলবে না?’ জিজ্ঞাসা করেছে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি এক প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র তার শিক্ষককে। এই ব্যাকুল প্রশ্ন বারেবারে অনুরণিত হয়েছে অনেক শিক্ষকের মনেও। অতিমারির বিপন্ন সময়ে তাঁরাও উপলব্ধি করেছেন যে এই ক্রান্তিকাল শুধু ভগ্ন-স্বাস্থ্যের অতিমারি নয়, একই সঙ্গে শিক্ষার দৈন্যেরও মহামারি; শিশুদের শৈশব চুরি যাবার, তাদের স্কুলজীবন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যাবার ঘোর আশঙ্কাময় দুর্দিন। করোনার আবহে প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যাগুলি তাঁদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার ও বুঝবার প্রয়াস এই প্রতিবেদনে। একই সঙ্গে তাঁরা এই কঠিন সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে কী ধরনের সৃষ্টিশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তার অনুসন্ধান ও বিবরণও এই সংকলনের লক্ষ্য। স্কুলের প্রতি তাঁদের ছাত্রদের আগ্রহের সুরে সুর মিলিয়ে শিক্ষকদের অনেকে বলেছেন, ‘আমরা বসে বসে বেতন চাই না’। অনেকেই তাঁরা সত্যি বসে নেই; অতিমারির নানা অনুশাসন ও সীমাবদ্ধতার মধ্যেও স্কুলের নানাবিধ প্রশাসনিক কাজের সাথে সাথে তাঁরা ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগের জাল বুনেছেন নতুন নতুন উপায়ে, নানা শিখন পদ্ধতির উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে চেষ্টা করেছেন যাতে স্কুলে না এলেও তাঁদের ছাত্ররা যেন পুরোপুরি ‘শিক্ষা-ছুট’ না হয়ে যায়।

প্রতিদিন ও দুর্দিন: প্রাথমিক শিক্ষার চালচিত্র

একথা ঠিক যে তথাকথিত স্বাভাবিক সময়েও শিক্ষার অনেক সমস্যা আছে, সেখানে বৈষম্য ও বিভাজন আছে। কিন্তু সেসব আরও গভীর ও প্রকট হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ক্রান্তিকালে। যেমন দেখা গেছে অতিমারির দুঃসময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে ‘ডিজিটাল হ্যাভস’ ও ‘হ্যাভ-নটস’দের মধ্যে ‘ডিজিটাল ডিভাইড’ এর সমস্যা নিয়ে। অবশ্য যেসব শিক্ষকের কথা আমরা শুনব এই সংকলনে

তাঁরা আন্তরজালিক শিখন পদ্ধতি নানাভাবে অনুসরণ করলেও, তাঁদের প্রান্তবর্তী ছাত্রদের জীবনে এবং অতিমারিতে গভীরতর প্রান্তিকতায় পর্যবসিত অস্তিত্বে, সেই পদ্ধতির সীমিত সম্ভাবনা সম্বন্ধে তাঁরা যথেষ্ট সচেতন। তাছাড়া, তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন যে বাচ্চার চোখ, তার স্পর্শ, এবং দিদিমণির হাসি--- এই সব মিলিয়ে আসলে স্কুল এর প্রাণোচ্ছলতা, যার উষ্ণতা অন্তরজালের যান্ত্রিকতা থেকে মেলে না। সরকারি প্রাথমিক স্কুলের এই শিক্ষকরা তাই 'এলিট' বেসরকারি স্কুলের প্রযুক্তি-নির্ভর রাজপথ ছেড়ে মেঠো পথে নেমে পড়েছেন তাঁদের ছাত্রদের সাথে পঠনপাঠনের সেতুবন্ধন রচনা করতে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ছাত্ররা পথশিশু, তারা গৃহহীন এবং এখন স্কুল-হীন, পাড়ার মন্দির বা চার্চের সিঁড়ি বা নদীর ঘাট তাই এখন তাদের, এবং সেই সঙ্গে তাদের মাস্টারমশাইদের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গন।

অন্যসময় বাচ্চাদের স্কুল-ছুট হবার সমস্যা নিয়ে কত কথা হয়েছে, আর আজ স্কুলই অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটিতে। যখন সবাই বাজার, ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজ কারবার ইত্যাদি কবে খুলবে বলে উদ্বিগ্ন, তখন বন্ধ স্কুলের সামান্য ঘরের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে কি তাঁরা ততোটা চিন্তিত? UNESCO-র পরিসংখ্যান অনুযায়ী করোনা-কালে সারা দেশে প্রায় ১৫ লক্ষ স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রায় ২৮ কোটি পড়ুয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং হচ্ছে। ৬০ লক্ষের মত ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আগে থেকেই স্কুল-ছুট হয়ে গিয়েছিল, এখন তাদের সঙ্গে মিলে গেল এই বিশাল ছাত্রদল । রেডিও, টেলিভিশন এবং মোবাইল প্রযুক্তির সাহায্যে তাদের শেখাবার কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, অবশ্য যদি প্রযুক্তি তাদের কাছে অধরা না থাকে তবেই; কিছুক্ষেত্রে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে শিখন সামগ্রী। কিন্তু প্রতিকূলতার বিশাল সিন্ধুতে এ হল প্রতিকারের সীমিত বিন্দু । এছাড়া, স্কুল নেই বলে স্কুল-মিলও নেই; লক-ডাউন এর কিছুটা পর থেকে শুকনো চাল, আলু বিলি শুরু হয়েছে স্কুলের বাচ্চাদের বরাদ্দ হিসাবে, যদিও স্কুলে রান্না করা গরম ও পুষ্টিকর খাবারের বিকল্প তা নয়। শিক্ষা ও পুষ্টির একযোগে বিকাশের যে ভাবনা ও সম্ভাবনা গড়ে তোলা হয়েছে স্কুলে, সেই যৌথ প্রয়াসও থমকে দাঁড়িয়েছে স্কুলের বন্ধদশার ফলে। অনেকের মতে, অতিমারি-ঘটিত স্কুল লক-আউট এর শিকার হয়েছে পুষ্টি ও লেখাপড়ায় ছেলেমেয়েদের অগ্রগতি, যে সীমিত অগ্রগতি মিলেছিল অনেক চেষ্টার পর। ২০১৫ থেকে ২০১৯-এর মধ্যে সেখানেও জ্বলে উঠছে নতুন অশনি সংকেত – National Family Health

Survey 5-এর সদ্য প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, এই সময়কালে ২২টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে ১৬টি তেই কম ওজনের বাচ্চার হার বেড়েছে। আবার সম্প্রতি Food and Agriculture Organization প্রকাশ করেছে The Report of the State of Food Security and Nutrition in the World 2020। সময়ের সাথে সাথে চলা অভিনব নজরদারির মধ্য দিয়ে যে বাস্তব তুলে ধরা হয়েছে এইখানে তা আমাদের পক্ষে বিশেষ উদ্বেগজনক। ২০২০-র এপ্রিল মাস নাগাদ, যখন স্কুলের বন্ধদশা তুঙ্গে, তখন সারাবিশ্বে প্রায় ৩৭কোটি ছেলেমেয়ে স্কুল-মিল থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল, যাদের একটি বিরাট অংশ আমাদের দেশের। এবং যে দেশ স্পষ্টতই ক্ষুধায় পীড়িত; The Global Hunger Index Report 2020-র তথ্য অনুযায়ী ক্ষুধার সূচকের নিরিখে ১০৭টি দেশের মধ্যে আমাদের দেশের স্থান ৯৪-এ, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপালের পিছনে, বহু দেশের নীচে।

তাই একথা শুনে আশ্চর্য হবার নয় যে অতিমারির দুর্যোগে, বিপন্ন, দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট বাবা-মা কাজের খোঁজে যেকোনো জীবিকা বেছে নিচ্ছেন, আর অনেকসময় সন্তানদেরও লাগিয়ে দিচ্ছেন সেই কাজে, বিশেষত স্কুলই যখন গরহাজির। আবর্জনা-কুড়ানো এক বাবা তাঁর ছেলেকে ডেকে নিয়েছেন একই কাজে, স্কুলের ব্যাগের বদলে আজ তার পিঠে ময়লা কুড়ানোর ময়লা ঝোলা। ছেলেটি তার বন্ধ স্কুলের ক্লাসরুমে ঘুরে এসেছে একবার, এই আশায় যে যদি সেটা খোলা থাকে। কর্ণাটকের টুমাকুর জেলার এই যে ছেলেটির কথা লিখেছেন একজন সাংবাদিক, তার মনের ব্যথা আর শারীরিক কষ্ট একই ভাবে ভোগ করছে দেশের নানা জেলায় ছড়িয়ে থাকা বহু ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। অতিমারির দাপটে নানা বিপন্নতার সাথে সাথে শিশুশ্রম, ছোট মেয়েদের বিয়ে ইত্যাদির সমস্যাও তাই তীব্রতর হচ্ছে । অর্থাৎ আপৎকাল আপাত-স্বাভাবিক কালের দুঃখ-কষ্ট, বৈষম্য ও বিভাজনকেই থাকবন্দী সমাজের নানা শ্রেণি ও বর্গের মধ্যে বেঁটে দেয়, যদি না সমাজ ও সরকার নানা প্রচেষ্টা ও প্রকল্পের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সেই কঠিনতর সমস্যার ভার খানিকটা লাঘব করে। শিক্ষার ক্ষেত্রে মাস্টারমশাই ও দিদিমণিরা কীভাবে পৌঁছনোর চেষ্টা করেছেন তাঁদের সাধারণ ছাত্রদের কাছে যাতে তাদের ‘স্কুল জীবনের আয়ু’ অকালে ফুরিয়ে না যায় এই মারি-ক্লিষ্ট দুঃসময়ে, তার একটি টুকরো ছবি তুলে ধরবার প্রয়াস এখানে, তাঁদের নিজেদের কয়েকটি লেখার সংকলনের মাধ্যমে।

ডিজিটাল ডিসট্যান্স

দেশ জুড়ে যখন 'সোশ্যাল ডিসট্যান্স' নিয়ে মাতামাতি, তখন শিক্ষাক্ষেত্রে প্রকট হয়ে উঠেছে ডিজিটাল ডিসট্যান্স, 'ডিজিটাল ডিভাইড' যার পরিণতি। নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতায় অনেক শিক্ষক বারবার এই সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন।

অতিমারির সময়ে শিক্ষা ও পাঠদানের জন্য প্রযুক্তির অত্যধিক ব্যবহার ও নির্ভরতার জন্য ডিজিটাল বৈষম্য এক ধাক্কায় বহুগুণ বেড়ে গেল। বেসরকারি বিদ্যালয় প্রযুক্তির ব্যবহার করে পাঠদান চালিয়ে যেতে পেরেছে মূলত 'চাহিদা' ও 'সরবরাহ' দুটি দিকেই সক্ষমতার কারণে। এই বিদ্যালয়গুলিতে প্রযুক্তির খানিক ব্যবহার আগে থেকেই ছিল, শ্রেণিকক্ষে বেশ কয়েক বছর ধরে 'স্মার্ট বোর্ড' এর প্রচলন হয়েছে।

অন্যদিকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, বিশেষত কলকাতা শহরের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, পরিকাঠামোগত খামতি এখনো চোখে পড়ার মতো। ইন্টারনেট পরিষেবার কথা ছেড়েই দেওয়া গেল, বেশিরভাগ বিদ্যালয়ে এখনও কম্পিউটার নেই। তাছাড়া ডিজিটাল মাধ্যমে পাঠদানের কোনো প্রশিক্ষণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ছিল না। সুতরাং 'প্রযুক্তির মাধ্যমে' পাঠদানে সরবরাহের দিক থেকে বেশ খানিকটা ঘাটতি ছিল। তবে এই অভাবকে যা অতিক্রম করে গেছে তা হল এই কঠিন সময়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা, তাদের শিক্ষকদের তরফ থেকে। যেমন, এক শিক্ষক ফোনের মধ্য দিয়ে যেটুকু যোগাযোগ করতে পেরেছিলেন করেছিলেন, রিডিং অভ্যাস বজায় রাখতে পুরোনো সংবাদপত্র জোগাড় করে নিয়মিত পাঠের পরামর্শ দিয়েছিলেন।

অন্যদিকে, প্রযুক্তির মাধ্যমে লেখাপড়ার 'চাহিদার' আঙ্গিকেও অর্থাৎ পরিবারের দিক থেকেও প্রভূত সমস্যার কথা জানতে পারা যায়। খোদ কলকাতা শহরের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়ে পড়ে এই রকম প্রায় ৪০শতাংশ পরিবারের স্মার্ট ফোন-এর ব্যবহার ছিল না। অনেক ক্ষেত্রেই পরিবারগুলি পাশের বাড়ির কারো সাহায্যে বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরেছিল। যাদের স্মার্ট ফোন ছিল সে ছেলেমেয়েরাও ক্রমশ অনলাইন-এ ক্লাস করার আগ্রহ হারিয়েছিল। একদিকে যেমন নেট সমস্যা ছিল অন্যদিকে কাজ হারানো অনেক পরিবারের কাছে শিক্ষার জন্য ডেটা চার্জ একটা অতিরিক্ত

আর্থিক বোঝা হয়ে দাঁড়াল। শিক্ষকের সঙ্গে নেট-বন্ধন ক্রমশ ক্ষীণ হতে থাকে, এবং লকডাউনের অতিরিক্ত কড়াকড়িতে গত এক বছরে শিক্ষকের সঙ্গে মুখোমুখি হতে পারেনি অনেক ছাত্রছাত্রী । অতিমারির আবহ ডিজিটাল বৈষম্য এক ধাক্কায় অনেকখানি বাড়িয়ে দিল। এছাড়া, অতিমারির কারণে ছাত্রছাত্রীরা এক বছরের বেশি সময় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুপস্থিত, শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষে পড়াশুনা ছাড়াও সহপাঠিদের সঙ্গে মতের আদান প্রদান, টিফিন ভাগ করে নেওয়া, নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি মিটিয়ে নেওয়ার যে সব সহজাত গুণ বা দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকত তা অব্যবহারে হারিয়ে যেতে বসল। এখনও আমরা শিশুর উপর এর দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল কী হবে জানি না, তবে কঠিন সময়ের শিক্ষা এই শিশুরা একেবারে ছোট বেলায় হাতে নাতে শিখে ফেলল, তাও কম বড় শিক্ষা নয়, বিপদের সময় একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর শিক্ষা।

নীতি এল চুপিসাড়ে

এই সংকলন আরও একটি বিষয়কে ছুঁয়ে গেছে, তা হল করোনার আবহে স্কুলশিক্ষায় নতুন নীতির উদঘাটন। কিছু শিক্ষক তাঁদের নিজস্ব মতামত রেখেছেন এই বিষয়ে এই সংকলনে। অতিমারিতে একদিকে যেমন স্কুলের কোলাহল বারণ করে দেওয়া হল স্বাস্থ্যরক্ষার আপাত তাগিদে, অন্যদিকে শিক্ষাব্যবস্থার সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা করা হল এই আপৎকালে কেন্দ্রীয় স্তরে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে । একদিকে বিদ্যায়তনের চলমান গতি রুদ্ধ হল, অন্যদিকে সচল হল নীতি বদলের পরিকল্পিত প্রক্রিয়া, কিন্তু প্রায় নিশ্চুপে, যাকে বলা যায় ‘reform by stealth’। অনেকের আশঙ্কা যে এই নীতির ক্রিয়া-কৌশলে ২০০৯-এর শিক্ষার অধিকার আইন-এর জোরালো খুঁটি নড়বড়ে হয়ে যাবে, যে অধিকার আজকের করোনা-ক্লিষ্ট, শিক্ষা-রিক্ত শিশুদের স্কুলজীবন ফিরে পাবার এক অনন্য হাতিয়ার। এই বিশেষ সময়ে যেমন স্কুল ছাত্রদের জীবন থেকে পলাতক, নতুন শিক্ষানীতিতে প্রস্তাবিত ‘school merger’– ‘school cluster’, ইত্যাদির মাধ্যমেও তথাকথিত স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও অনেক পাড়ার স্কুল পাকাপাকিভাবে হারিয়ে যাবে কিছু কিছু ছাত্রের চোখের সামনে । তখন ঘরের থেকে দূরে চলে যাওয়া স্কুলে পড়তে যাবার অতিরিক্ত ব্যয়ভার সরকার বহন করবে কি না সে বিষয়ে কোনও স্পষ্ট ঘোষণা বা ইঙ্গিত কিন্তু নতুন শিক্ষানীতিতে মেলে না। আবার পাঠ্যসূচিতেও অনেক পরিবর্তনের ইঙ্গিত এই নীতিতে, যার ফলে দেশের বৈচিত্র্যময়, ঋদ্ধ

ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে খণ্ডিত ও সংকীর্ণ করে তুলবার সমূহ সম্ভাবনা। অতিমারির ঘোর অনিশ্চয়তার পরিবেশে, প্রায় বিনা আলোচনায় এইসব সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের পদক্ষেপ আমাদের ভাবতে বাধ্য করে শিক্ষার রাজনীতি নিয়ে, যা ক্রান্তিকালেও সতত সক্রিয়, যদিও সেই সক্রিয়তা অনেকটাই অগণতান্ত্রিক মতে ও পথে।

দুঃসময়ের পেডাগগি - সংযোগ ও সহযোগ

এই সংকলনের মূল লক্ষ্য হল অতিমারির সংকটকালে অনেক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ছাত্র-শিক্ষক সংযোগ ও সেতুবন্ধনের কাহিনি তুলে ধরা। সেইসব অণু-কাহিনি ছড়িয়ে আছে পাড়ায় পাড়ায়, শহরের প্রান্তে ও গ্রামের ভিতরে, যা প্রায়শই প্রচারের অন্তরালে রয়ে গেছে। ক্রান্তিকালের এই গুরুশিষ্য সংবাদ, বিশেষ করে শিক্ষকদের শিখন উদ্ভাবনীর প্রচেষ্টা, তাঁদের ভাষ্যে তুলে ধরবার তাগিদে এই সংকলন। অধ্যাপক অমর্ত্য সেন-এর মতে দুঃসময়কে প্রায়ই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি হিসাবে দেখবার প্রবণতা থাকলেও, আসলে আপৎকাল সহযোগিতার সেতু রচনার কাল, সহমর্মিতার জাল বোনার সময়, সমাজের নানা গোষ্ঠী, পরিবারের ও পাড়ার নানা সদস্য, শিক্ষকদের নানা দল, এবং সর্বোপরি সামাজিক নাগরিকতার চেতনায় অনুপ্রাণিত মানুষজনের মধ্যে। এইরকম সমাজমনস্ক কিছু নাগরিক-শিক্ষক-এর যে দায়বদ্ধতা ও মরমী দৃষ্টির উদাহরণ পাওয়া গেছে তাঁদের ছাত্রদের লেখাপড়ার প্রতি, তা লিপিবদ্ধ করবার প্রয়োজন আছে সবার জন্য শিক্ষার অধিকার ও শিক্ষায় গণতান্ত্রিক চেতনা রক্ষা করবার স্বার্থে।

একথা ঠিক যে ছাত্র-শিক্ষকের যোগাযোগের তার বারেবারে ছিঁড়ে গেছে। যত দিন গেছে, লকডাউন সপ্তাহ থেকে মাসের পর মাসে গড়িয়ে পড়েছে, মাঝে আমফানের ঝড় এসে সবকিছু আরও লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে, ততই শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রের যোগসূত্র শিথিল থেকে শিথিলতর হয়েছে। প্রথম প্রথম অন্তরজালে বা ফোনের মাধ্যমে যে কথাবার্তা চলত তা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়েছে যখন অপরপ্রান্তে সাড়া মেলেনি, কখনও পরিষেবার অভাবে, কখনও বা ফোন চালু রাখবার ন্যূনতম সামর্থ্যের অভাবে। দূরভাষের দূরত্বে যোগাযোগ সহজ ছিল না, কিন্তু তা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ল যখন যোগাযোগের বৃত্ত থেকে কিছু কিছু ছাত্র পুরোপুরি হারিয়ে গেল। missing school আর missing children-এর মাঝখানে পড়ে শিক্ষকেরা অনেকেই তাই অসহায়

বোধ করেছেন। তবে তাঁদের শিক্ষকসত্তা ভুলতে দেয়নি ছাত্রদের। তাই কেউ কেউ তাঁদের ছাত্রদের বলেছেন, 'তোমরা আমাদের চিঠি লেখ'। আবার কেউ কেউ ভেবেছেন যে শিক্ষার্থী ছাড়া তাঁর শিক্ষক পরিচয়ই মুছে যাচ্ছে। যেমন শোনা গেল একজন দিদিমণির কণ্ঠস্বর, 'রেললাইনের দুধারে বাস করা বাচ্চারা আমাদের স্কুলে পড়তে আসে। ওরা সন্তানের মত। ওদের সঙ্গে কতদিন থাকিনি , নিজেরও চোখে জল আসে, মনে হয় আমরা আর teacher নই'। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে খুঁজছেন অকৃত্রিম আগ্রহে, এও গুরুশিষ্য পরম্পরার একটি দিক যার রূপ পরিস্ফুট হল শিক্ষার এক সংকট মুহূর্তে। এই আগ্রহ অনেক শিক্ষকের মধ্যে জন্ম দিয়েছে পঠনপাঠন নিয়ে নতুন পরীক্ষানিরীক্ষার ইচ্ছে ও সাহসকে। অনেক ছাত্র তাদের পরিবারের সঙ্গে ফিরে গেছে নিজেদের দেশে । সঙ্গে বই নিয়ে যেতে পারেনি অথবা তা হারিয়ে ফেলেছে। শিক্ষকরা তাদের প্রকৃতি থেকে শিখবার উৎসাহ দিচ্ছেন, তাদের চারপাশের গাছ, ফুল, পাখি দেখে আনন্দ পাবার ও সেখান থেকে শিখবার বার্তা পাঠাচ্ছেন। পরিবেশ এখন তাদের পড়ার বই, দিদিমণি ফোনে বলছেন, 'তোমার বাড়ির গাছে আজ তিনটে ফুল ফুটেছে। তুমি পুজোর জন্য দুটো ফুল নিয়েছ, গাছে আর কটা রইল?' এইভাবে সংখ্যা পরিচিতি, যোগ বিয়োগ, শব্দ ও ভাষা পরিচয় ইত্যাদির পাঠ চলেছে ছাত্র ও শিক্ষকের দূরবর্তী যুগলবন্দীতে, আর পাশে রয়েছে বন্ধু প্রকৃতি। এইসব নানা পাঠ পদ্ধতির বিবরণ দিয়েছেন শিক্ষকরা এই সংকলনে।

তাঁরা আরও যে বিষয়টি নিয়ে বিশেষ ভাবে সচেতন ও চিন্তিত তা হল এই যে এতদিন অনভ্যাসের পরে কোন কৌশলে ছাত্রদের স্কুলে ফিরিয়ে আনা যাবে এবং কীভাবে তাদের ভুলে যাওয়া প্রায়-শূন্য শেখার ঝুলি আবার নতুন করে ভরে দেওয়া যাবে। এই ছোট ছোট ছাত্রের সদ্য অঙ্কুরিত জ্ঞানের ভাণ্ডার, যা অতিমারিতে হঠাৎ খালি হয়ে যেতে বসেছে, তা আবার সযত্নে, কোন শিখন পদ্ধতিতে সমৃদ্ধ করে তোলা যাবে? সিলেবাস cover করাই কি হবে মূল লক্ষ্য, না কি তাদের জন্য কিছু মৌলিক ভাবনার চাবিকাঠি uncover করাই হবে সঠিক পথ?

স্কুলে ফেরা

এখন যে অভিযান খুব জরুরি, তা হল স্কুলে ফেরার অভিযান। যেসব ছাত্রছাত্রীরা বন্ধুহীন একা ঘরে হাঁপিয়ে উঠেছে, বা পথে পথে ঘুরে ঘুরে দিন কাটাচ্ছে, বা মাঠে, রাস্তারধারের দোকানে, ইঁটভাটায়, আবর্জনার স্তূপে কায়িক

পরিশ্রম করতে করতে শিশু থেকে শ্রমিক হয়ে পড়েছে, তাদের স্কুলে ফেরানোর অভিযান। একই সঙ্গে আর একটি জরুরি প্রশ্ন হল স্কুলে ফিরে লেখাপড়ার এতদিনের বন্ধ চাকা প্রথম দিকে কোন গতিতে আবার চালু করা বাঞ্ছনীয় হবে। আর এবিষয়ে চিন্তাভাবনা ও প্রস্তুতি তো এখন থেকেই নিতে হবে। অর্থাৎ নতুন করে স্কুল খোলার মানে কী হবে তা নিয়ে আলাপ আলোচনায় কিছু কিছু শিক্ষক নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছেন এইসময়ে। তাঁদের কেউ কেউ মনে করেন যে স্কুল খুললে গোটা পাঠ্যক্রম-এর উপর জোর দেবার পরিবর্তে বুনিয়াদী শিক্ষার উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন, আর তাঁদের মতে, লেখাপড়ার মৌলিক রসদের পাঠদান খুব বেশি সময় ব্যয় না করেও করা যায়। দুঃসময়ের পেডাগগি থেকে পোস্ট-লকডাউন পেডাগগি-র রূপান্তর কীভাবে হওয়া দরকার তা নিয়ে প্রস্তুতিপর্ব শুরু করতে আগ্রহী অনেক শিক্ষক। তাঁদের লেখায় এবিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। সরকারি স্কুলের এই শিক্ষকরা আরও যে বিষয়টি অনুধাবন করছেন আজকের পরিস্থিতিতে তা হল এই যে অভিভাবকদের মধ্যে সরকারি স্কুলের প্রতি আগ্রহ কিছুটা বাড়ছে, বিশেষ করে যে বাবা-মায়ের পক্ষে আর্থিক টানাটানির কারণে বেসরকারি স্কুলের খরচ সামলানো বেশ কষ্টকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাঁদের মধ্যে। জরুরি কথাটা হল এই যে বাচ্চাদের তাঁদের শ্রেণিকক্ষে ফেরানো, তাঁদের বন্ধুদের কাছে ফেরানো আশু প্রয়োজন। তাদের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ তৈরি করবার কাজে এর কোনও বিকল্প নেই। আরও বড় সত্য হল এই যে শিক্ষার এই সংকটকালে শিশুশিক্ষার অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করা শুধু ব্যক্তিগত বা পারিবারিক দায় হতে পারে না, তা প্রধানত দাবী করে সুদৃঢ় সামাজিক অঙ্গীকারের । আর সেই অঙ্গীকারকে পুষ্ট ও লালন করবার জন্য প্রয়োজন হয় সংযোগ ও সহমর্মিতার জলসিঞ্চনের । যে শিক্ষকদের লেখা এখানে সংকলিত তাঁরা সবাই সেই জলসিঞ্চনের কাজে ব্যস্ত আছেন এই দুর্দিনে এবং অন্যদিনে ।

ছাত্ররা কোথায়, কেমন আছে, অতিমারির কালবেলায়? আলাপে শিক্ষকরা ও প্রতীচী

উর্বা চৌধুরী

কোভিড-১৯-এর অতিমারির কারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০২০ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে রাজ্যের সমস্ত ইস্কুল বন্ধ রাখার একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। এই প্রাথমিক বিজ্ঞপ্তিটিতে ইস্কুল খোলার সম্ভাব্য তারিখ ১১ই জুন ২০২০ উল্লেখ করা হয়। যদিও পরবর্তী সময়ে সরকারের তরফে এই সিদ্ধান্ত একেবারেই বদল করতে হয়, এবং এখনো অবধি অষ্টম শ্রেণি অবধি ইস্কুল খোলার তারিখ সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তই নেওয়া যায়নি। এই গোটা সময়কালে শিক্ষকদের সঙ্গে প্রতি মাসে একটিবার করে অভিভাবকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্ভব হয়, মিড-ডে-মিল-এর খাদ্যসামগ্রী বন্টনের সময়। এক শিক্ষকের কথায়, অভিভাবকের মাধ্যমে হলেও ওই একটি সময়েই প্রায় সমস্ত বাচ্চার সঙ্গে ইস্কুলের যোগাযোগের উপায়টিতে কোনো বৈষম্য ঘটেনি।

এই ব্যতিক্রমী, অনিশ্চিত ও সংকটের সময়ের কথা মাথায় রেখে প্রতীচী ইন্সটিটিউট ২০২০ সালের এপ্রিল মাস থেকেই কলকাতা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের ইস্কুলগুলির মধ্যে একুশটি ইস্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে অনলাইনে ধারাবাহিক যোগাযোগ করা শুরু করে। প্রাথমিকভাবে এই যোগাযোগের উদ্দেশ্য ছিল, সংকটকালে শিশুরা, তাদের অভিভাবকেরা, ও শিক্ষকেরা কী কী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, তা সমাধানের কী কী উপায় বার করছেন ও তাতে কতটা সফল হচ্ছেন, তা জানা। এই সময়ই শিক্ষকেরা প্রতীচীর সঙ্গে নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কী ধরনের যৌথ কাজ করতে পারে তা নিয়েও আলোচনা হয়।

দীর্ঘদিন ইস্কুল বন্ধ থাকায় অনভ্যাসের কারণে বাচ্চাদের মধ্যে নিয়মিত ইস্কুলে আসার ব্যাপারে কোনো অনীহা তৈরি হচ্ছে কি না, বা তার ফলে স্কুলছুট বেড়ে যেতে পারে কি না, এবং সেক্ষেত্রে শিক্ষকেরা কী উপায় বার করছেন, এছাড়া

বাচ্চারা লকডাউন পর্যায়ের আগে যা শ্রেণিকক্ষে শিখেছে, সিলেবাসের সেই অংশগুলি যাতে বাচ্চারা মনে রাখতে পারে, দরকারে গোটা পাঠ্যসূচিকে কার্যকরী, সংক্ষিপ্ত ও পাঠক্রম অনুসারে নতুন করে তৈরি করার কথাও আলোচনায় বারবার উঠে এসেছে। বাচ্চাদের বাসস্থানের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা, ঝুপড়িতে ঘিঞ্জি বসতি অঞ্চলে, এক কামরার ঘরে দিনযাপন, তার মধ্যেই সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেতে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার বিচিত্র বাস্তবতার কথা বলেছেন শিক্ষকেরা। জানিয়েছেন কীভাবে এরই মধ্যে বাচ্চাদের তাঁরা বলে গেছেন নিজের খেয়াল রাখতে, পরিবারের কথা ভাবতে, এমনকী প্রতিবেশীর কথাও ভাবতে।

উত্তর কলকাতার জোড়াবাগান অঞ্চলের অবিনাশী বিদ্যালয়— হিন্দি মাধ্যমের এই ইস্কুলটিতে পার্শ্ববর্তী বসতি অঞ্চলের বাচ্চা যেমন আসত, তেমনি আসত আশপাশের ফুটপাতে থাকা বহু পরিবারের বাচ্চাও। অতিমারি পরিস্থিতি ও লকডাউনের আগে। ইস্কুলের মাস্টারমশাই, রাজেশ শ্রীবাস্তব, জানালেন যে, লকডাউন চলাকালীন প্রথম দফায় মিড-ডে-মিলের খাদ্যসামগ্রী বন্টনের সময়েই তাঁরা দেখেছিলেন ফুটপাতে থাকা মোট ১৬জন বাচ্চা ও তাদের পরিবারের কোনো হদিশ মিলল না। তারপর থেকে সেই পরিবারগুলি কোথায় গেছে, তা আজ অবধিও জানা যায়নি। এভাবেও ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে বহু পরিযায়ী শ্রমজীবী বাচ্চা ও তাদের পরিবার। হতে পারে তারা বিহার, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থানে, তাদের গ্রামে ফিরে গেছে, কিংবা অন্য কোথাও। কলকাতার বড়বাজার অঞ্চলের আরেক হিন্দি মাধ্যম ইস্কুল শ্রী আর. পি. ইন্সটিটিউট , ইস্কুলের শিক্ষক, শ্রী বিনয় কুমার ওঝা, জানতে পেরেছেন যে, ওঁর ইস্কুলের বাচ্চারা কেউ কেউ পরিবারসহ, কেউ আবার একাই ফিরেছে ভিন্ন জেলায়, ভিন্ন রাজ্যে, নিজেদের গ্রামে। এভাবেই অসংখ্য পরিযায়ী পরিবার তাদের বাচ্চাসহ ইস্কুলের পরিবৃতির মানচিত্রের বাইরে চলে গেছে, বেশিরভাগই চলে গেছে নিঃশব্দে, বিনা নোটিশে। খোঁজ পাওয়ার মতো কোনো সূত্রই তারা ছেড়ে যায়নি। কলকাতার হিন্দি ও উর্দু মাধ্যম ইস্কুলগুলির বাচ্চাদের পরিবার মূলত ভিন রাজ্য থেকে কর্মসূত্রে এখানে এসে বসবাস করে। অতিমারি ও বিনা নোটিশে ঘোষিত লকডাউন এই পরিবারগুলির কার্যত এক উপার্জনশূন্য অবস্থা হয়, ফলে বেশিরভাগই ফিরে যেতে থাকে নিজভূমে। রাজভবন ফ্রি প্রাইমারি স্কুল (ইউনিট ১)-এর শিক্ষক অলিম্পিয়া বড়ুয়ার মুখে শোনা গেছে আরেক ধরনের সংকটের কথা। ওঁর ইস্কুলের বাচ্চারা বা তাদের

পরিবার অতিমারি সময়কালে কলকাতা ছেড়ে না গেলেও তারা যেহেতু মূলত ফুটপাতে, রেললাইনের ধারে, ঝুপড়িতে বসবাস করে তাই সেক্ষেত্রে মূল দুশ্চিন্তার জায়গা ছিল তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি নিয়ে। একই শহরে দুটি ইস্কুল, ট্যাংরা মুসলিম বয়েজ স্কুলের বাচ্চা তাদের পরিবারসহ কলকাতা ছেড়ে চলে গেলেও ঠনঠনিয়া নাইট প্রাইমারি স্কুল (উর্দু মিডিয়াম)-এর বাচ্চারা বা তাদের পরিবার থেকে যায় কলকাতার বাসাবাড়িতেই। এই দুই স্কুলের শিক্ষক মুরশিদ আলম ও মহম্মদ শাকিল এজাজ-এর কাছে জানতে পারি যে, দুটিতেই যে হিন্দি ও উর্দুভাষী বাচ্চারা আসে, তাদের আদি বাস বিহার বা উত্তরপ্রদেশে। অর্থাৎ একই আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতেও সবক্ষেত্রেই পরিযায়ী পরিবারগুলিও যে একই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তেমনটা নয়। তবে বিপন্নতা সকলেরই এক— তীব্রতর অর্থ সংকট ও জটিলতর টিঁকে থাকার লড়াই।

স্কুলছুট হওয়ার এই সম্ভাব্য সংকটের মধ্যেও শিক্ষকেরা জানিয়েছেন যে, ইস্কুলে বাচ্চা ভর্তির প্রশ্নে তাঁরা দুটি প্রকট সম্ভাবনা আঁচ করছেন, পরিযায়ী পরিবারগুলি একটা সময়ের পর শহরে ফিরবে, ও বাচ্চাগুলি আবার ইস্কুলে আসতে শুরু করবে এবং অঞ্চলের যে বাচ্চারা বেসরকারি ইস্কুলে যাচ্ছিল, অতিমারি পরিস্থিতিতে উপার্জনের সংকটের কারণে তারাও বেসরকারি ইস্কুলের খরচ বহন না করে সরকারি ইস্কুলগুলিতে ভর্তি হতে পারে।

এই অতিমারির সময়কালে প্রতি মাসে একটিবারই ইস্কুলবাড়ি খুলত, সে সময় বাচ্চাদের অভিভাবকেরা আসতেন মিড-ডে-মিলের খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করতে। বরাদ্দ দুই কেজি চালসহ কখনো দুই কেজি আলু বা এক কেজি আলু, এক কেজি ছোলা, বা কোনো এক মাসে আড়াইশো গ্রাম মসুর ডাল সংগ্রহ করতে, সাত আট কিলোমিটার পায়ে হেঁটেও আসতে দেখা গেছে অভিভাবকদের। প্রথম দফার খাদ্যসামগ্রী বন্টনের সময় যতজন আসতে পেরেছিলেন, পরের দফাগুলিতে, দেখা গেছে, যত আর্থিক অবস্থা নড়বড়ে হয়েছে, তত বেশি সংখ্যক অভিভাবক মিড-ডে-মিলের খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করেছেন। এমনকি, বহু বাচ্চা যারা স্বাভাবিক অবস্থায় ইস্কুল চলাকালীন, বাড়ির আপত্তির কারণে মিড-ডে-মিলের খাবার খেত না, তাদের অভিভাবকেরাও এই সময়ে খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করেছেন, এক শিক্ষক অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে আমাদের জানালেন, বেশ কিছু বাচ্চার পরিবার আর্থিক সচ্ছলতার কারণে মিড-ডে-মিলের খাবার খাওয়ার ক্ষেত্রে আপত্তি ছিল। কোনো শিক্ষক এও জানিয়েছেন, ইস্কুলে বাচ্চাদের মধ্যে আর্থ-সামাজিক বর্গের পার্থক্য থাকা

সত্ত্বেও একইসঙ্গে একই রকমের খাবার খাওয়ার যে বৈষম্যহীন প্রথা, তার কারণেও বাচ্চাদের মিড-ডে-মিলের খাবার খাওয়ায় বিরত রেখেছিল কিছু সুবিধাপ্রাপ্ত অবস্থায় থাকা পরিবার। এ প্রসঙ্গে আলোচনায় বোঝা গেল যে, অতিমারি বহুজনকেই নানা নেতিবাচক সামাজিক নির্মাণ ও রক্ষণশীলতার শেকল থেকে মুক্তি দিয়েছে, যদিও তার জন্য মূল্যও দিতে হয়েছে ঢের, কঠিন আর্থিক সংকট, সার্বিক নিরাপত্তাহীনতার চরম অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়াতে হল বিশাল সংখ্যক পরিবারকে।

মিড-ডে-মিল নিয়ে আলোচনা চলাকালীন শিক্ষকেরা বারবার বলেন, খাদ্যসামগ্রীর তালিকায় প্রোটিন জাতীয় খাবার যেমন, ডিম, সয়াবিন বড়ি, ডাল বাধ্যতামূলক করা খুব প্রয়োজন। কিন্তু এক বছর গড়িয়ে যেতে চলল, মার্চ ২০২০ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২১ অবধি গুণগত ও পরিমাণগতভাবে যে বাচ্চার যা প্রাপ্য, মিড-ডে-মিল কর্মসূচিতে সেই খাদ্যসামগ্রী বন্টন করা হল না।

প্রতীচীর সঙ্গে প্রাথমিক ইস্কুলের শিক্ষকদের নিরবচ্ছিন্ন কথোপকথনে জানতে পারা গেল, কী প্রচণ্ড এক সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তাঁদের ইস্কুলের বাচ্চাদের পরিবারগুলি, লাগামছাড়া কাজ হারানো, পরিযায়ী শ্রমজীবী পরিবারগুলির প্রায় সবহারা অবস্থার উদ্বেগ, কর্মী ছাঁটাই, বেতন হ্রাস, বেতন বন্ধ হওয়ার মতো বিপন্নতায় জর্জরিত অবস্থার কথা জেনে, শহরের দারিদ্র্যের এক ভয়াবহ ছবি স্পষ্ট ধরা পড়ল। আরো নির্দিষ্টভাবে বোঝা গেল, কলকাতা শহরে সরকারি ইস্কুলে যে বাচ্চারা পড়ছে, তাদের লেখাপড়া শেখার বাস্তবতাকে বিচার করার সমান্তরালে তাদের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার কথা মোটেই ভুললে চলবে না। এই পরিবারগুলির উপার্জনকারীরা হলেন মূলত অসংগঠিত ক্ষেত্রে দৈনিকের হিসাবে কর্মরত। এঁদের কাজ এমনিতেই অনিশ্চয়তায় ভরা থাকে, অতিমারি পরিস্থিতি সেই অনিশ্চয়তাকেও ছাড়িয়ে এক চরম অবস্থা তৈরি করল, ভালো সংখ্যক কাজ হারালেন, বাধ্য হলেন নিজেদের জীবিকা বদলাতে। বহু অভিভাবক যাঁরা ছোট কারখানা, বা ছোট উদ্যোগে অস্থায়ী কর্মী হিসাবে বা দিনমজুরিতে কাজ করছিলেন তাঁরা বেশিরভাগই কাজ হারালেন। জানা গেল, তাঁদের মধ্যে অনেকেই কোনোক্রমে মাছ সবজি জোগাড় করে পাড়ায় পাড়ায় ফেরি করতে শুরু করেছেন।

পাইকপাড়া রাজা মণীন্দ্র মেমোরিয়াল প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক, কাকলি দাস দে, জানালেন ওঁর ইস্কুলের বাচ্চাদের পরিবারের বড়রা অনেকেই জরির কাজ করে

জীবিকা নির্বাহ করতেন, সেই সব জরিশিল্পীরা কাজ হারিয়েছিলেন লকডাউনের পর্যায়ে। কেউ কেউ পরে জরির কাজ শুরু করলেও, বাজারের বেহাল অবস্থায়, যা উপার্জন হচ্ছিল, তা দিয়ে সংসার চলা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। একই অঞ্চলে বহুজন নিযুক্ত ছিলেন টালা ব্রিজের নির্মাণ কর্মী হিসাবে, লকডাউন পর্যায়েও এঁদের সেই কাজটি বহাল ছিল। আলোচনায় দি ওরিয়েন্টাল সেমিনারি বয়েজ প্রাইমারির শিক্ষক, রীনা হালদার, জানান যে, ওঁর স্কুলটি কলকাতার সবচেয়ে বড় যৌনপল্লী, সোনাগাছি সংলগ্ন। ফলে ওঁর ইস্কুলে সোনাগাছি থেকে বহু বাচ্চা পড়তে আসে। অতিমারি ও লকডাউন পরিস্থিতি এই অঞ্চলের পেশাজীবী মানুষের পক্ষে এক অসহনীয় অবস্থা তৈরি করে। পেশার কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, মায় প্রায় কোনো বিকল্প উপার্জনের উপায় না করতে পারায় যৌনকর্মীরা এক প্রাণান্তকর অবস্থায় পড়েন। অতিমারির ব্যাধির বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্যবিধির কারণে লকডাউনের পর, উপার্জনের প্রশ্নে আজও ওঁদের পায়ের তলায় মাটি একেবারে নড়বড়ে হয়ে আছে।

এই সবটাই বারবার শিক্ষকদের দুর্ভাবনায় ফেলেছে যে, ইস্কুল খুললেও কি বাচ্চারা ইস্কুলে ফিরবে, ফিরলেও কি তা আদৌ নিয়মিত হবে? নানা বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে এও জানা যাচ্ছিল যে, কোনো কোনো বাচ্চা কাজে যুক্ত হয়েছে, কেউ কেউ রাস্তায় মায়ের সঙ্গে ফুল বিক্রি করতে বসেছে।

শিক্ষকদের সঙ্গে প্রতীচীর কথোপকথন যত এগোতে থাকে, এই ধরনের সংকটগুলি থেকে মুক্তি পেতে ও সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য বেশ কিছু সম্ভবপর প্রস্তাব ও পদ্ধতি নিয়েও আলোচনা হয়, বিশেষভাবে ভাবনাচিন্তা করা হয়--- ইস্কুলে ভর্তি, উপস্থিতির ধারাবাহিকতা ও স্কুলছুট আটকানোর উপায় নিয়ে। অতিমারির বিপর্যস্ত অবস্থাটি সম্পর্কে সতর্কতা বজায় রেখে, ইস্কুলের বাচ্চাদের বসতি অঞ্চলে গিয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখা গেলে বাচ্চাদের ইস্কুলে নিয়মিত আসা খানিকটা নিশ্চিত করা যায় বলে শিক্ষকেরা মনে করছিলেন।

যদিও পরিস্থিতি এখনো প্রাথমিক বা উচ্চপ্রাথমিক ইস্কুল খোলার পক্ষে অনুকূল বলে মনে করেনি সরকার, তাই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ক্লাস চালু হলেও, নিচু ক্লাস এখনো চালু হয়নি, তবু বছরভর আমাদের বেশ কিছু পরিকল্পনা চলছিল সত্বর ইস্কুল খুলবে, এমনটা আশা করে। যেমন, শিক্ষকেরা

প্রস্তাব করেন যে, ইস্কুল খোলামাত্র পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে প্রথমেই বাচ্চাদের সঙ্গে বসে একটি বেসলাইন অ্যাসেসমেন্ট করা জরুরি। এতে এতদিনের শারীরিক বিচ্ছিন্নতার পর পাঠ্যসূচি অনুযায়ী বাচ্চা কোন অবস্থানে আছে তা বোঝা সম্ভব হবে। কতটা তারা মনে রেখেছে, কতটা ফের মনে করতে শিক্ষকের সহযোগ লাগবে তা বুঝে নিতে সাহায্য করবে। এছাড়াও প্রস্তাব আসে, কীভাবে ইস্কুল খোলার পর বাচ্চার প্রথম একটি মাস ইস্কুল ও শ্রেণিকক্ষে কাটবে, মান্য শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতিকে একটি মাস বাদ দিয়ে বাচ্চাকে আগে সহায়তা করতে হবে তার দীর্ঘ গৃহবন্দী দশার অস্বস্তি কাটাতে। এ প্রসঙ্গে আবার শিক্ষকেরা এও মনে করছিলেন যে, বাচ্চাদের মন বেশ সংবেদনশীল হলেও, নতুন নানা কিছুর সঙ্গে তাদের মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাও চমৎকার হয়, বাচ্চাদের মনের এই গুণটি অনেকটাই সাহায্য করবে শিক্ষকদের কাজে। আলোচনায় বহু শিক্ষক বারবার বাচ্চাদের সম্পর্কে তাঁদের এই আস্থা ও প্রত্যয়ের কথা উল্লেখ করেন। এছাড়াও পাঠ্যসূচিকে কীভাবে ছোট ও কার্যকরী করে তোলা যায়, এই বইয়ে সে সংক্রান্ত চর্চাও রেখেছেন শিশু শিক্ষা নিকেতনের মাস্টারমশাই দীপক রায় এবং গার্ডেন ফর চিলড্রেনের শিক্ষক শুচিব্রত গুপ্ত। শিক্ষকেরা এও বলেন, ইস্কুল খোলার পর ছুটির দিনেও ইস্কুল খোলার কথা ভাবা যেতে পারে। খোওয়া যাওয়া সময়ের বেশিরভাগটাই ফিরে পাওয়া যাবে না, তবে ন্যূনতমটুকু ফেরানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। বাচ্চাদের শেখার ক্ষেত্রে কিছু বাড়তি সহযোগ লাগবে এ কথা মনে করিয়ে দিয়ে বারবার শিক্ষকেরা বলেন বাচ্চাদের বাড়ির কথা, বাড়ির বড়দের কথা, ইস্কুলের শিক্ষার ঘাটতি যে হয়েছে তা নিশ্চিত। গোটাটাই যান্ত্রিকভাবে বাচ্চাকে শিখিয়ে দেওয়ার বা 'পাঠ্যসূচি শেষ করা' বলতে যা বোঝায়, তা করা অবাস্তব; তবে যে বাড়তিটুকু বাচ্চা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করবে, এবং পাঠক্রমকে যতটা ছুঁতে পারা বিজ্ঞানসম্মত–– তার জন্য ইস্কুলের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িকেও বেশ কিছুটা বাড়তি উদ্যোগ করতে হবে।

বাড়ি ছাড়াও শিক্ষকদের মতে বাচ্চাদের স্কুলশিক্ষার স্তর কার্যকরীভাবে পেরোনোর জন্য তাদের প্রতিবেশের মানুষজনের নিবিড় আগ্রহ ও ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণভাবে স্বাস্থ্যের গুরুত্ব নিয়েও আলোচনা করা হয়। বাচ্চাদের মধ্যে ব্যক্তিগত ও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি হওয়ার প্রশ্নেও তার প্রতিবেশের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে শিক্ষকদের মত ছিল, ইস্কুল খোলার পরপরই তারা

বাচ্চাদের বসতি অঞ্চলে নির্বীজকরণের কাজ করার জন্য কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন-এর সঙ্গে যোগাযোগ করবে। সামুদায়িক এই প্রচেষ্টা প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে, জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষার প্রশ্নে বাচ্চার বসতি অঞ্চলেও যে সচেতনতা ও যোগদান বাড়ানোর জন্য ইস্কুলকে কাজ করতে হবে, তা বলা হয়।

উৎকণ্ঠার সঙ্গে আলোচিত হয় অনলাইন-এ শিক্ষা প্রসঙ্গে, শিক্ষকেরা তাদের ইস্কুলের বাচ্চাদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বরাবরই জানতেন, উপরন্তু এই অতিমারি পরিস্থিতিতে তাঁরা বাচ্চাদের ও তাদের পরিবারগুলিকে সংকটে প্রায় ডুবে যেতে দেখছিলেন। এমনকী প্রায় সব শিক্ষকই পরিবারগুলিকে অপরিহার্য খাদ্য ও অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর বন্দোবস্ত করে যাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায়, চারপাশে প্রবলভাবে অনলাইন ক্লাসের রব উঠতে শুরু করল। বেসরকারি ইস্কুলগুলিতে যে তৎপরতায় বাধ্যতামূলক হয়ে উঠল এই ব্যবস্থা, তাতে করে একেই একমাত্র স্থায়ী বিকল্প কোনো ব্যবস্থা বলে মনে হল। শিক্ষাক্ষেত্রে আর কোনো উপায়ই যেন নেই ভারতবর্ষের মতো দরিদ্র মানুষের দেশে। বেসরকারি ইস্কুলগুলিতে তো বটেই, বেশ কিছু সরকারি ইস্কুল যেখানে তুলনায় সুবিধাপ্রাপ্ত পরিবারের বাচ্চারা এসে অভ্যস্ত, সেখানেও এই ব্যবস্থা জায়গা করে নিল। অথচ বাকি রইল বেশিরভাগ শিশুই , যাদের পরিবার কোনোমতেই ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে আজও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণ করতে পারছে না। এরই মধ্যে এই অপারগতার কারণে, নিজেদের অসহায়তার সঙ্গে যুঝতে না পেরে, দেশে একাধিক আত্মঘাতের খবরও শোনা গেল, কখনো ছাত্র, কখনো বা কোনো মা। আমাদের সরকারি প্রাথমিক ইস্কুলগুলির দশ-বারো শতাংশ বাচ্চাকে ছোঁয়া গেল এই পদ্ধতিতে। বাদ পড়তে থাকল বেশিরভাগ বাচ্চাই। এর মধ্যেও শিক্ষকেরা চেষ্টা ছাড়েননি, সে কথাও আছে এই বইয়ে, শিক্ষকেরা লিখেছেন কীভাবে এমন অসহনীয় পরিস্থিতিতেও তাঁরা বাচ্চাদের নিরবচ্ছিন্নভাবে শিখতে সাহায্য করে গেছেন। কীভাবে সাহায্য নেওয়া হয়েছে বাচ্চাদের প্রতিবেশীদের, অন্যান্য আত্মীয়দের। যদিও এত কিছু সত্ত্বেও এখনো বিশাল সংখ্যক বাচ্চার কাছে পৌঁছোনো যায়নি, এদের কারও পরিবারে স্মার্টফোন নেই, কারও কোনো ফোনই নেই, বেশিরভাগের পক্ষেই ইন্টারনেটের খরচ চালানো অসম্ভব ছিল। এই বাধা পেরোতে রাজভবন ফ্রি প্রাইমারি স্কুল (ইউনিট ১)-এর শিক্ষকেরা পৌঁছে গেছেন বাচ্চাদের ফুটপাতের ঝুপড়িতে, রেললাইনের ধারের ঝুপড়িতে, তবু বাচ্চাদের ও তাদের পরিবারের

সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হননি, কোনোমতে হারিয়ে যেতে দেননি কোনো বাচ্চাকে।

এক অতিমারির সংকট, তার উপর ছিল ২০২০ সালের মে মাসের আমফানে ঘটে যাওয়া বিপর্যয়। বহু বাচ্চার ঘর ভেঙেছে, নিশ্চিহ্ন হয়েছে মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও। কাউকে কাউকে কিছু এনজিও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়ায় বেঁচে থাকতে খানিক সাহায্য হয়েছে। যতটুকু যোগাযোগ রাখা যাচ্ছিল, আবহাওয়ার কারণে ফোনের নেটওয়ার্কের নিষ্ক্রিয়তায় তাও ছিন্ন হয়েছিল এই সময়ে, কোনোমতে জানাই যাচ্ছিল না বাচ্চাগুলির খবর।

দুর্বিষহ এই একটি বছর বাচ্চা ও তাদের পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকদেরও কাটছে চরম অশান্তিতে। তার মধ্যেই শিক্ষকেরা প্রতীচীর সঙ্গে অবিরাম অনলাইন সাধারণ সভায়, কর্মশালায়, আলোচনা সভায় জুড়ে থেকেছেন। এই জুড়ে থাকাই শেষমেশ সুনিশ্চিত করেছে বাধা কাটিয়ে প্রতীচীর ও শিক্ষকদের এগোতে পারাকে।

ঘুম ভাঙার পর

শুচিব্রত গুপ্ত
গার্ডেন ফর চিলড্রেন

সেদিন সকালে অনেকটা আগেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। তার প্রায় পরপরই ফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল-- ওপারে ঈশানের বাবা, খোকন হালদার। খোকনবাবুর গলায় উদ্বেগ , ''স্যার, আপনি কি কোনো কাজ দিয়েছেন?''

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলাম, প্রশ্নটা বুঝে উঠতে খানিক সময় লাগল,''ও, হ্যাঁ! আমাদের একটা দায়িত্ব এসেছে ছাত্রছাত্রীদের কাছে কিছু কাজের পাতা পৌঁছে দেওয়ার, সেরকমই কয়েকটা পাতা ফোনে পাঠানো হয়েছে । কেন বলুন তো?''

''না, আসলে ছেলে বলছিল, কাল ওর সাথে ওর বন্ধু, দেবরাজের দেখা হয়েছিল। দেবরাজ ওকে জিজ্ঞেস করছিল কোনো কাজ পেয়েছে কিনা!''

''ঈশান কী বলল?''

''ঈশান বলেছে যে.....আসলে স্যার, আমার ফোনে তো কিছু আসেনি! ওকে কীভাবে দেব কাজগুলো? আমার ফোনে তো কোনো ছবি.....''

চরম লজ্জা নিয়ে জিজ্ঞেস করতে হল ''আপনার মোবাইলে কি হোয়াটসঅ্যাপ আছে?''

''না স্যার, আমার ফোন তো ওরকম না.....''

কথাটা শুনেই ধাক্কা খেলাম। নিজেকে সামলে নিয়ে ওঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বললাম ''চিন্তা করবেন না, আমরা আপনাদের কাছে পৌঁছে দেব সময়মতো। ঈশানকে একটু দিন।''

ঈশানের সঙ্গেও কথা হল। আশ্বস্ত করলাম। ফোন রাখার আগে থেকেই ওই ছোট্ট প্রশ্নগুলি যন্ত্রণাদায়ক হতে শুরু করল। সামনে এনে দিল অনেকগুলো

ভাবনা--- শিক্ষার সর্বজনীনিকরণ, শিক্ষায় সাম্য, সকলের জন্য শিক্ষার অধিকার।

আকস্মিক এক পরিস্থিতির শিকার আমরা সবাই। বিশ্বজুড়ে কোভিড-১৯-এর ত্রাস। এক অজানা আতঙ্ক গ্রাস করেছে সকলকে। আর এই অদৃশ্য শত্রুর হাত থেকে মুক্তি পেতে যাবতীয় সতর্কতামূলক যে ব্যবস্থাগুলি নেওয়া দরকার, এই বিষয় নিয়ে প্রতিদিন যে যে অভ্যাসগুলি গড়ে তোলা জরুরি; প্রায় প্রতিনিয়ত নানান বিজ্ঞপ্তি, বিবিধ মিডিয়ার অডিও ভিশ্যুয়াল ক্লিপিংস-এর নানা প্রচার অভিযানকে সঙ্গে নিয়ে চলতে গিয়েও কোথাও কোথাও থমকে দাঁড়াতে হচ্ছে। এই যেমন সেদিন বাজার যাওয়ার পথে ঘটল। পথে ঘাটে এখন চেনা মুখও মুখবন্ধনীর আড়ালে অচেনা, তবু যেন ঠাওর করতে চেষ্টা করলাম । হ্যাঁ, ইনি তো এই রুটেই অটো চালাতেন! সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই চিনতে পারলেন- ''কী নেবেন?'' মুখে লেগে থাকা কষ্টের হাসি ছাপিয়ে ভিতর থেকে এল প্রশ্নখানা। একপাশে লেবু আর একপাশে ডিম সাজিয়ে, বিক্রি করছেন। নিলাম প্রয়োজন মতো। আসার পথে ভ্যান-রিক্সায় সবজি বিক্রেতাদের দেখছিলাম - বুঝতে অসুবিধা হল না - ফিরলাম ওঁদের উদ্দেশ্যে । এই মানুষগুলিকে দেখে, ওঁদের কথা ভেবে, এক অস্থিরতা কাজ করছে। চোখে ভাসছে আমার স্কুল। এঁদের সন্তানেরাই যে আমাদের স্কুলগুলির অধিকাংশ শিক্ষার্থী, আমাদের সন্তানসম। জীবনে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে এঁদের নিত্যসঙ্গী নানা অস্থিরতা। আজ সেই অস্থিরতা একেবারে স্পষ্টত এঁদের শরীরের টিঁকে থাকার লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। তবু জানি, এই নিরুপায়তাকে এঁরা কিছুতেই জিততে দেবেন না, এঁরা দমে যাবেন না, বরং নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়বেন জীবনযুদ্ধে। আরও অনেকের মতোই।

কিন্তু অদৃশ্য এই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই চালানোটাই যে মূল চ্যালেঞ্জ। আসলে এখানে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে ঢাল-তরোয়াল নিয়ে নেমে পড়াটাই শেষ কথা নয় বরং নিজেকে শত্রুর বিরুদ্ধে /বিপক্ষে উপযোগী করে তোলাটাই শুরুর কাজ। একটা দীর্ঘ সময় ধরে স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে সমাজে সচেতনতা বাড়ানোর কাজ কম হয়নি, কম হচ্ছে তাও না, আর সে কাজ চলবেও। অথচ একটা কথা বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে বরাবর— আগে খিদেটা মিটুক, বেঁচে থাকি, তারপর অন্য সব কিছু ভাবা যাবে। কিন্তু অতিমারির সময়ে এই দুশ্চিন্তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। করোনার মতো মারণ ভাইরাসের সঙ্গে যুঝে বেঁচে থাকাটাই সংকটের। জন্ম থেকে মৃত্যু, দিন শুরু থেকে শেষ— একটি কথা খুব কঠিন হলেও সহজভাবে বুঝে নিতে

হবে যে, ন্যূনতম স্বাস্থ্যবিধিটুকু মেনে আজ প্রতিটি মানুষকে যেভাবে চলতে হচ্ছে, সেই চলাকেই হয়তো চিরতরে একটি স্বাভাবিক জীবনধারণের অংশ করে নিতে হবে। অযথা আতঙ্কিত না হয়ে একে বধ করার জন্য নিজেদের স্বভাবকে বদলাতে হবে। ফলত এই বোধ থেকেই মনের ভিতর উঠে আসছে অসংখ্য প্রশ্ন— প্রতিদিনের রোজগার কতটা হওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়? কোনো একটি ছোটো এলাকায় ঘেঁষাঘেঁষি করে যে বসতবাড়িগুলি রয়েছে, তা কি আদৌ স্বাস্থ্যসম্মত? বাজারগুলিতে জনসমাগম কীভাবে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে? নিত্যযাত্রার ব্যবস্থাপনা কী হওয়া আবশ্যিক হবে?

এইভাবে ভাবতে গেলে ঘরে আটকে থাকা ছাড়া হয়তো আর কোনো উপায় বেরোবে না। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের জন্য ঘরে বসে থাকা মোটেই সম্ভব নয়, ফলে অজানা এই শত্রুর সামনে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করেই এগোতে হবে। যদিও সেখানেও প্রশ্ন ডাক্তার থেকে স্বাস্থ্যকর্মীরা তো বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েও, যাবতীয় প্রস্তুতি নিয়েও কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হচ্ছেন। ফলে, সতর্কতার মাত্রা নিয়েও প্রশ্ন স্বাভাবিক কারণেই থেকে যায়। এই অবস্থায় আর কী কী করলে নিরাপদ হওয়া যেতে পারে। ধারাবাহিকভাবে শিবির করে, এলাকায় এলাকায় প্রচার চালিয়ে, বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে, প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় অবধি সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার্থী সহ সব স্তরে নানা কর্মসূচির মাধ্যমে সচেতনতা বাড়ানোর আহ্বান দিয়ে, অভিযান চালিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় আছে কি? স্বাস্থ্যসচেতনতা নিয়ে উদ্যোগ দশকের পর দশক ধরে কম হয়নি। আগামিতে তা বাড়বে বৈ কমবে না। কিন্তু মানুষ হিসাবে আমাদের হুঁশ ফেরে না!

একদল মানুষ মানবে, একদল মানবে না। প্রথমাবস্থায় ভয়ের কারণে যতটা আমরা নিজেদের সামলাতে পেরেছিলাম, যত দিন যাচ্ছে অনন্যোপায় হয়ে রাস্তায় নামতে বাধ্য হতে হচ্ছে। রোজগার বন্ধ হলে চলবে কীভাবে? মরিয়া হয়ে হয়তো মনে হচ্ছে, ঘর থেকে বেরোতেই হবে, তবু ভুলে যাওয়া চলে না যে, দিনান্তে ঘরে ফিরতে হবে, থাকতে হবে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে, পরিবার থাকছে নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে। একজন সচেতন থাকলে যে সংক্রমণ এড়ানো যায়, আবার বাস্তবকে তাচ্ছিল্য করলে সেই একজনই তো ডেকে আনতে পারেন চরম বিপদ।

ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত একপ্রকার, তবে রাষ্ট্র ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেতে

দিতে পারল না, ফলে যা হওয়ার আপাতত ঘরে থেকেই হবে বলেই রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত হল। বেসরকারি পরিকাঠামোয় তাই ঘরে বসে থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য অনলাইন ক্লাস চালু হল, কিন্তু সরকারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা? যাদের অধিকাংশের বাড়িতেই এই সুবিধা নেই বা আগে থেকে থাকলেও, যাঁদের বাড়ির বড়দের কাজ হারিয়ে আজ অসহায় অবস্থায়, তাদের ঠিক কী হবে? জায়গায় জায়গায় বিতরণ শিবির থেকে পরিবারকে তাঁরা খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে এনে দেবে, নাকি সন্তানের অনলাইন ক্লাসের উপযোগী করে তোলার চেষ্টা করবে, তা ভেবে কুল পাওয়া যাচ্ছে না। এই রকম পরিবারে থাকা শিক্ষার্থীদের কথা অজানা নয় শিক্ষাদপ্তরেরও। বিতরণে পাওয়া খাবার প্যাকেটে দিনযাপনের মাঝে শিক্ষার প্রয়োজনীয় আলোটুকু পৌঁছে দেওয়া এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। স্বাভাবিকভাবেই এই মানুষগুলির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা শিক্ষককূলও দিশাহীন।

আসা যাক এই ছোট্ট সদস্যদের কথায়। এদের কথোপকথন দিয়েই শুরু করেছিলাম আলোচনা। যে শিশুরা আমাদের সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলোতে আসছে, তাদের বেঁচে থাকার লড়াই কঠিন থেকে কঠিনতর হতে দেখলাম আমরা। বেশিরভাগ এই ছোট্ট বন্ধুদেরই এমন ফোন নেই, যা দিয়ে তারা অনলাইন বা ভার্চুয়াল ক্লাসরুমের দুনিয়ায় পা রাখতে পারে। তাদের বাবা-মায়েদেরও গর্ব করে বলার উপায় নেই ''ওরা অনলাইন ক্লাস করছে।'' অগত্যা এই মুহূর্তে কিছুই করার নেই। কিন্তু সত্যি কি তাই? নাকি এই অনেককিছু না থাকার মধ্যে থেকে বেশ কিছুকে খুঁজে নেওয়া সম্ভব! এখানেই চ্যালেঞ্জ আমাদের। যতটা সম্ভব এই শিশুদের সাথে যোগাযোগ রেখে যাওয়া সম্ভব, রেখে যেতে হচ্ছে, হবেই। পুঁথিগত লেখাপড়ার অভ্যাস থেকে দূরে থাকছে বলে কিছু শিখছে না ওরা, এরকম নয়। অন্ততঃ এই সময় ওদের মনে যে ধারণাটিকে বদ্ধমূল করছে, তা হল--- শুধু করোনা নয়, আগামী দিনে এর থেকেও বেশি মারাত্মক অদৃশ্য শত্রুর আক্রমণ আসতে পারে যার থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখাই হবে জীবনের মূলমন্ত্র। নিজে- পরিবার- এলাকা- এইভাবে একটা গোটা বিশ্বকে নিয়ে ভাবতে শিখেছে ওরা। এই শিক্ষাবর্ষে দাঁড়িয়ে ওরা যে দিনগুলিতে স্কুলমুখি হতে পারল না, এমনকি বাড়িতে থেকেও সেইভাবে বইমুখি হতে পারল না, সহযোগীর অভাবে মূলত পাঠ্যবই সম্বন্ধীয় যে যে বিষয়ে ধারণা বা জ্ঞানগঠনে বাধাপ্রাপ্ত হল, সেই বিষয় বা বিষয়গুলি সম্পর্কে হয়তো অনেক কিছু জ্ঞান আহরণ অসমাপ্ত থেকে যাবে, অন্যান্য

বছরের মতো করে যে সুযোগ তাদের পাওয়ার কথা ছিল, কেবল পরিকাঠামোর দুর্বলতার কারণে আর কোনোদিনই জ্ঞান আহরণের এই সুযোগ তারা পাবেনা , এরকমটা নয়। বরং এই সময়ের, এই অবস্থার সঙ্গে তাদের প্রতিদিনের চলা, ওদের বাস্তব বোধ, অনুভূতি এবং জ্ঞানকেও পরিশীলিত করবে। পাশাপাশি অবশ্যই যেটা ভাবতে হবে, এতদিন শিক্ষককূল পুঁথিতে উল্লেখ করা যে বিষয়গুলিকে নিয়ে তাদের সঙ্গে বাস্তবের যোগাযোগ ঘটাতেন; এবার থেকে শিক্ষার্থীদের বাস্তবিক জ্ঞানের সঙ্গে পুঁথিতে উল্লেখ করা বিষয়গুলিকে মেলাতে বিশেষ যত্নশীল, বা যুক্তিপরায়ণ হতে হবে। বাকি কাজটা নিশ্চিতভাবেই সময়ের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এগোবে। চিরকালই আমাদের মতো শিক্ষকদের কাজের পথে নানা আর্থ-সামাজিক বাধা এসেছে, বাধা অতিক্রম করে শিক্ষার্থীদের শিখতে সাহায্য করাই তাই একভাবে আমাদের যোগ্যতার মাপকাঠি। মূল্যায়ন কেবল শিক্ষার্থীদের নয়, এবার কার্যত মূল্যায়ন হবে রাষ্ট্রের এবং আমাদের মতো শিক্ষকদের, আমরা কতটা পারি আর রাষ্ট্রই বা কতটা পারে।

ভাইরাস, অতিমারি, স্যানিটাইজার... নতুন শেখা শব্দ ও দূর-শিখন

কাকলি দাস দে
পাইকপাড়া রাজা মনীন্দ্র মেমোরিয়াল প্রাইমারি স্কুল

আমি কাকলি দাস দে, পাইকপাড়া রাজা মনীন্দ্র মেমোরিয়াল প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা। এটি উত্তর কলকাতার একটি স্কুল, এবং এখানে স্থানীয় অঞ্চল অর্থাৎ লিচুবাগান বস্তি, চিৎপুর লকগেট অঞ্চল, কাশিপুর বিবিবাজার, টালা ব্রিজের নিচের ঘোষপাড়া বস্তি, চুনিবাবুর বাজার, আশুবাবুর বাজার সংলগ্ন বস্তি থেকে ছাত্রছাত্রীরা পায়ে হেঁটে পড়তে আসে। নানা ভাষা, নানা জাতি ও ধর্মের এক সুন্দর মেলবন্ধনে আমাদের ছাত্রছাত্রী এবং আমাদের একটাই পরিচয় আমরা ভারতবাসী। আমাদের প্রাক-প্রাথমিক থেকে প্রথম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ১৪৫জন ছাত্রছাত্রী পড়ে, যাদের মধ্যে ১৮জন শিক্ষার্থী বিশেষ চাহিদসম্পন্ন, তবে কোনোমতেই বিশেষ দ্বিধাগ্রস্ত তারা নয়। সকল ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক-অভিভাবিকা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে আমাদের একান্নবর্তী পরিবারটি আজ এই অতিমারিকালেও মানসিক দিক দিয়ে প্রবলভাবে জোটবদ্ধ।

আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় পেডাগগি বা শিক্ষণ বিজ্ঞান। এটি আসলে একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, যে পদ্ধতিতে শিখনের বিষয়বস্তু নানা রীতি-নীতি প্রয়োগ করে একটি পরিকল্পনা মাফিক উপায়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীদের পৃথকভাবে পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষার্থীর প্রতিদিনকার তাৎক্ষণিক শারীরিক ও মানসিক পরিস্থিতি বিচার করে এবং অধিকাংশ শিক্ষার্থীর আর্থসামাজিক অবস্থানের কথা মাথায় রেখে পাঠক্রম এবং বাস্তব পারিপার্শ্বিক জ্ঞানের মিশ্রণে পাঠপরিকল্পনা করা হয়। প্রতি শিক্ষার্থীর উপযোগী কর্মপত্র তৈরি করে শিক্ষার্থীদের সার্থক, সার্বিক ও সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও বিকাশ সাধন করা হয়ে থাকে। শিখনের যে ধাপগুলি আমরা এক্ষেত্রে অনুসরণ করি, সেগুলো হল—

১) আনন্দের সঙ্গে ও সক্রিয়ভাবে শিখতে সাহায্য করা।

২) ব্লুমস ট্যাক্সোনমি অর্থাৎ জ্ঞান, বোধ, প্রয়োগ, বিচার, বিশ্লেষণ, মূল্যায়নের স্তরগুলিতে পা রেখে ধাপে ধাপে শিক্ষার্থীকে স্বাধীন, স্বকীয় চিন্তনে সাহায্য করা এবং তাকে প্রয়োগের স্তরে পৌঁছাতে সাহায্য করা।

৩) বিভিন্ন ধরনের প্রকল্পধর্মী কাজ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর সম্যক, ও সুস্পষ্ট জ্ঞানলাভে ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে সাহায্য করা।

৪) খেলার মাধ্যমে শিখতে সাহায্য করা।

৫) পিয়ার লার্নিং অর্থাৎ পারস্পরিক সাহায্য ও আদান প্রদানের মাধ্যমে শিখতে সাহায্য করা।

৬) এছাড়া কথোপকথন, আলাপ আলোচনা, গল্প বলা, অভিনয়, প্রশ্নোত্তর, প্রকৃতি ভ্রমণ ইত্যাদি নানা পদ্ধতি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীকে শিখতে সাহায্য করা।

যা যা আমরা করি বলে জানাচ্ছি, আসলে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে তার বাস্তবতা হল, আমরা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা আমাদের এই করাগুলি নিয়ে মার্চ ২০২০ অবধি মেতে ছিলাম 'স্কুল' নামের এই গবেষণাগারে। এই গবেষণাগারে প্রতিনিয়ত, শিশুর চাহিদা অনুযায়ী তৈরি হচ্ছিল নতুন নতুন পদ্ধতি--- যার একটাই লক্ষ্য, সকল শিশু অর্থাৎ দ্রুত শিখে ফেলা শিশু, সময় নিয়ে শিখতে থাকা শিশু, এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু, সবার নিশ্চিত সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও উন্নতি। এভাবেই সুন্দর, আনন্দময়, কর্মমুখর দিনগুলোয় আমাদের পেডাগগির রূপায়ণ হচ্ছিল।

এমন সময় সারা বিশ্বে উপস্থিত হল মারণ রোগ, কোভিড-১৯। যার দাপটে অতিমারি বা প্যান্ডেমিক, যা আমাদের কারোর কাছে কোনোভাবেই পরিচিত ছিল না। রোগ ঠেকাতে সবার আগে প্রাথমিক কর্তব্য হিসাবে শিক্ষার্থীদের গৃহবন্দী হওয়াকে বাধ্যতামূলক করতে হল। মনে আছে সেই দিনটা, ১৩ই মার্চ, যেদিন আমাদের বাচ্চাদের জন্য হঠাৎ করে ছুটি ঘোষণা করা হল। সেদিনকার অকস্মাৎ ছুটির ঘোষণায় ওরা যেন হকচকিয়ে গিয়েছিল। আজও চোখে ভাসে ওদের সেদিনকার জিজ্ঞাসু ছলছল চোখগুলো, কারণ তখন আমরা ২৭শে মার্চ

অনুষ্ঠিতব্য একটি ‘গণিত উৎসবের’ প্রস্তুতিতে সদলবলে ব্যস্ত ছিলাম। ক্ষুদেগুলো তখন তন্ময় হয়ে ছিল অঙ্কের ধাঁধা ও খেলায়। যাই হোক, ঘোষণা হওয়ামাত্র আমরা, শিক্ষক-শিক্ষিকারা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সকল অভিভাবক-অভিভাবিকাদের জড়ো করলাম বৈঠকে। ই-পোর্টাল থেকে অভিভাবকদের দেওয়া ফোন নম্বরগুলি মিলিয়ে নিতে শুরু করলাম। যাদের আগে দেওয়া ফোন নম্বরের অস্তিত্ব নেই আশেপাশে কোনো প্রতিবেশীর ফোন নম্বর তৎক্ষণাৎ জোগাড় করে নথিবদ্ধ করলাম।

ওইদিনই আপৎকালীন তৎপরতায় একটি লিখিত নোটিশ দেওয়া হল এবং সেটি সকল ছাত্রছাত্রীর খাতায় লিপিবদ্ধ করা হল ।একটা খাতায় মার্চের গোড়া থেকেই শিশুদের এই রোগ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করানো হচ্ছিল--- তাই তারা বুঝল যে, এই রোগকে ঠেকানোর জন্য আমরা কিছুদিন দূরে থাকব। কিন্তু দূরে থাকলেও আমরা রোজ যেমন ইস্কুলে নিয়মিত কিছু কাজ করি সেরকমই কিছু কাজ বাড়িতে থেকেও করতে হবে। এমনকি নানা নিয়ম ছোটদের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির বড়দেরও পালন করতে হবে। এতদিন তারা কেবলই শিক্ষার্থী ছিল, এখন তাঁদের ভূমিকা শিক্ষকেরও। আসলে তখন আমরা শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রধান চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলাম যাতে করে সকল শিশু ও তার পরিবার শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকে। কারণ অতিমারির পর যেদিনই স্কুল খুলুক শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা যেন তাঁদের ভবিষ্যতের উন্নতির বাধা না হয় ।

শিশুদের দেওয়া নোটিশটি ছিল এইরকম—

১) এক ঘন্টা অন্তর সাবান দিয়ে হাত ধোবে অন্তত ২০ সেকেন্ড ধরে। মুখে স্বাস্থ্যবিধির গান গাইবে, ‘‘এবার হাতে সাবান লাগিয়ে’’ বা ‘‘রোগ নয় নয় ব্যাধি নয় নয়’’। স্কুলে শেখানো স্বাস্থ্যবিধির দুটি গান স্কুলে যেমন রোজ গাও, তেমনি বাড়িতেও গাইতে হবে। হাত ধোয়ার ৫টি ধাপ নিজেরাও অনুসরণ করবে, বাড়ির ছোট ভাই-বোন ও বড়দের করাবে। হাত ধোয়ার জায়গায় হাত ধোয়ার ৫টি ধাপের যে আঁকা স্কুলে শেখানো হয়েছিল, সেগুলি এঁকে টাঙিয়ে রাখবে এবং তীর চিহ্ন দিয়ে সাবানটিকে দেখাবে যাতে সাবান দিয়ে হাত ধুতে ভুল না হয়।

২) জানলা দিয়ে বাড়ির বাইরেটা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করবে। বাড়ির বাইরের কাউকে থুতু বা কফ ফেলতে দেখলে তাদের বারণ করবে। তোমাদের

এতদিন হাঁচি বা কাশির সময় মুখ নাক ঢাকা দিতে বলা হয়েছিল, এবার ওই হাতটিও সাবান দিয়ে ধোওয়ার অভ্যাস নিজে করবে এবং বাড়ির ছোট ও বড়দের করাবে।

৩) এই সময়ে সজাগ থাকবে, রেডিও বা টিভির খবরে বা রাস্তায় কোনো ঘোষণা হলে, সেখানে কী বলছে, তা মন দিয়ে শুনবে। যেগুলো অবশ্যই পালনীয় বলে মনে হবে, সেগুলি কাগজে বড় বড় করে লিখবে। এতদিন যেরকম নানা পদযাত্রায় পোস্টার লিখেছ, সেরকম পোস্টারের মতো করে জরুরি বিষয়গুলি, যা আমাদের রোগ থেকে রক্ষা করতে পাবে, তা লিখবে এবং বাড়ির বাইরের দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখবে। তোমরা ছোটরা আজ থেকে দায়িত্ব নাও, বড়দের সতর্ক করো।

৪) সারাদিনে যখনই মা রান্না করবেন, তখনই মাকে বলবে, ভাতের ফ্যানটা হাওয়ায় ঠাণ্ডা করে রাখতে। জল খাবারে ওটাই নুন লেবু দিয়ে খেয়ে দেখবে, চমৎকার খেতে, পুষ্টিও প্রচুর। তেমন করে বাছা বাছা তরকারির খোসা ভালো করে ধুয়ে, সিদ্ধ করে নুন গোলমরিচ দিয়ে চমৎকার জলখাবার তৈরি হবে। এরকম সহজ প্রাপ্য জিনিস দিয়ে তোমরা নতুন নতুন রেসিপি বানাবে এবং খাতায় লিখে রাখবে। স্কুল খুললে আমরা চড়ুইভাতি করে রেসিপির প্রতিযোগিতা করব। যার রেসিপি সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর হবে, তাকে পুরস্কৃত করা হবে।

৫) এই দুর্দিনে কেউ খাবার নষ্ট করবে না। যতটা খেতে পারবে ততটুকুই নেবে। কেউ কারো এঁটো বা উচ্ছিষ্ট খাবার খাবে না, অন্য কাউকে খেতে দেবে না কারণ এই রোগটা লালারসের মাধ্যমেও ছড়ায়। সম্ভব হলে রাতে পশু-পাখিদের কিছু খাবার দিও, কারণ খাবারের দোকানের খাবার এখন তারা পাবে না। তারাও খুব কষ্টে থাকবে। রোগ থেকে সবাই নিজেকে রক্ষা করবে। বাইরে থেকে এলে যেন মা-বাবা জামাকাপড় সাবান দিয়ে কেচে, মুখ হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে, স্নান করে ঘরে ঢোকেন - সেই বিষয়ে তোমরা সতর্ক করবে। কোনো প্রতিবেশীর কোভিড হলে তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস বা ওষুধগুলি দেওয়ার সময়ে দূরত্ববিধি বজায় রাখেন সেই অনুরোধ করবে।

৬) স্কুলে শেখানো নাচ, গান, ব্রতচারী, ছড়ার ব্যায়ামগুলি রোজ বাড়িতে অভ্যাস রাখবে। শ্বাস প্রশ্বাসের যে যোগ ব্যায়াম শেখানো হয়েছে, সেগুলি নিজেরাও করবে এবং বাড়ির বড় ও ছোটদের করাবে। এতে শরীরে অক্সিজেন

এর মাত্রা বাড়বে, যা আমাদের রোগটি থেকে রক্ষা করবে।

৭) ঘরের সব কাজ যেমন ঝাড়ু দেওয়া, জামাকাপড় কাচা, জল তোলা, এগুলিতে মা-বাবাকে সাহায্য করবে।

৮) গাছের পরিচর্যা করবে। গাছে ফুল ফুটলে, তারিখসহ সেই ফুলটির ছবি খাতায় এঁকে রাখবে।

৯) অন্ধকার নিঃঝুম আকাশের দিকে তাকিয়ে তারাদের চেনার চেষ্টা করবে। কোনটি ধ্রুবতারা এবং তাহলে সেদিকটা কোন দিক, এছাড়া অন্য তারামণ্ডলগুলিও বইয়ের পাতা থেকে চেনার চেষ্টা করবে। খাতায় এঁকে রাখবে।

১০) প্রতিদিন ভোর থেকে উঠে রাতে ঘুমোতে যাওয়া অবধি কী কী কাজ করেছ, তা নিয়ে দিনলিপি লিখবে। কোনো মজার ঘটনা ঘটলে, তাও তারিখসহ লিখে রাখবে। কোনো মজার দৃশ্য দেখলে ছবি এঁকে রাখার চেষ্টা করবে।

১১) মন খারাপ করলে খাতায় তারিখ দিয়ে চিঠি লিখবে। আমাদের যে যে মনের কথা বলতে ইচ্ছে হবে, সব লিখে রাখবে।

১২) ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়ে তোমাদের এতদিন যত হাতের কাজ, কোলাজের কাজ শেখানো হয়েছে, তা বাড়িতে করবে।

পাখির যত্ন নেওয়ার সময়ে ছাত্র

লকডাউনের সময়ে গাছের পরিচর্যায়

আসলে আমাদের স্কুলের অধিকাংশ পড়ুয়া অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার থেকে আসে। মায়েরা লোকের বাড়িতে গৃহসহায়িকার কাজ করেন, বাবারা হয় রিকশা বা ভ্যান চালক বা কোনো ছোটোখাটো কাজে ঠিকাশ্রমিক। দিনান্তে একবেলাই বাড়িতে রান্না হয়। আর ওদের একবেলার খাবার স্কুলের মিড-ডে-মিল থেকেই হয়। কিন্তু স্কুল বন্ধ হলে বাচ্চাগুলো খাবে কী? ওদের মা বাবাদের কি কাজ থাকবে? এই সংকটময় বাস্তব পরিস্থিতির কারণে প্রাথমিকভাবে আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল, ওদের শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ রাখা। তাই ১২দফা আচরণবিধি নোটিশ আকারে স্কুল বন্ধের দিনই ওদের কাছে পৌঁছে দিই। কারণ তখন আমরা নিশ্চিত ছিলাম না যে, ফোনে কথা বলে বা কোনোভাবে মেসেজের মাধ্যমে আদৌ ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারব কি না? কারণ যেখানে পেটের ভাত জোটানো দুষ্কর, সেখানে ফোন বা ইন্টারনেট-এর বিলাসিতা কী করে সম্ভব?

১৫ই মার্চ ২০২০ তারিখে স্কুল বন্ধের পর ২১শে মার্চ দপ্তর থেকে জরুরি নির্দেশ পাওয়ায় হঠাৎ করেই মিড-ডে-মিলের ২কেজি চাল আর ২কেজি আলু বণ্টনের মাধ্যমে অভিভাবকদের সঙ্গে দেখা হওয়ার সুযোগ এসে গেল। এই দিনে বিদ্যালয়ে পৌঁছে চাল আলু দেওয়ার পাশাপাশি আমরা বাচ্চাদের জমা রাখা বই--- মজারু, কুটুমকাটুম ইত্যাদি বইগুলি অভিভাবকদের হাতে তুলে দিই আর জানাই ফোনে যোগাযোগ করে বাচ্চাদের যতটা সম্ভব পড়ানোর চেষ্টা করা হবে। কারণ ততদিনে আমরা বুঝতে পারছিলাম এই বন্ধ হয়ে যাওয়া স্কুল খুলতে সময় লাগবে। রোগটির ভয়াবহতা কিছুটা হলেও আন্দাজ করতে পারছিলাম।

এর পর লকডাউনে আমরা সকলেই হলাম গৃহবন্দি। ফোন ও ইন্টারনেট-এর ক্ষুদ্র পরিসরে শিক্ষার বিশাল ব্যাপ্তিকে নির্বিচারে ছেঁটে রুদ্ধ করা হল। পেডাগগির যে বৈজ্ঞানিক ধাপ, তা হয়ে পড়ল একমুখি। গন্তব্যে পৌঁছানোর অজানা পথে ঝোড়ো হাওয়ায় নিভু নিভু প্রদীপের শিখাকে আমরা দুই হাত দিয়ে আগলে, মরিয়া প্রচেষ্টায় পাড়ি দিলাম।

স্কুল বন্ধের পর, ফোন করে বইয়ের পাতার নম্বর বলে দিয়ে ফোনে কনফারেন্স কলের মাধ্যমে একাধিক বাচ্চাকে রিডিং পড়তে বলতাম, সরব পাঠ, শুনে শুনে ভুল সংশোধন করার চেষ্টা করতাম। বারবার পড়ে উচ্চারণগুলি স্পষ্ট করার চেষ্টা করতাম, নতুন শেখা বানান, শব্দগুলি খাতায় লিখে রাখতে বলতাম।

সেগুলি প্রয়োগেরও নানা পদ্ধতি বলতাম, এভাবেই চেষ্টা চালু রাখা হল। ভাষা শিক্ষা, পরিবেশ এভাবে হলেও, অসুবিধা হত অংকে। তাতেও যথাসম্ভব নতুন নতুন পদ্ধতির প্রয়োগ খুঁজে ও অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনায় প্রয়োগ করতাম। এই ব্যাপারে প্রতীচী ট্রাস্ট-এর পক্ষ থেকে অনেক উপকৃত হই। 'স্কুল অ্যাক্টিভিটিস' নামক হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে নানা রকম পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের কাছে চমকপ্রদ ও আকর্ষণীয়ভাবে কী উপায়ে দূর থেকে পাঠ্য বিষয়বস্তু পৌঁছে দেওয়া যায়, সেগুলি দেখছিলেন কলকাতারই বহু প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা বন্ধুরা, কলকাতা জেলা শিক্ষা দপ্তরের শ্রী সুন্দর ব্যানার্জি সহ প্রতীচী ট্রাস্টের বন্ধুরা। আমরা সেগুলির যথাযথ প্রয়োগ করে, দিনগুলি একেবারে যাতে নিষ্ফল না কাটে, তার চেষ্টা করতে থাকি। এক্ষেত্রে একেবারেই বাস্তব পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করেই শিক্ষার্থীদের কর্মমুখি করা হয়। নতুন শেখা শব্দ, ভাইরাস, কোভিড-১৯, প্যানডেমিক, অতিমারি, কোয়ারেন্টিন, লকডাউন, স্যানিটাইজার, কনটেইনমেন্ট, ইত্যাদি তাদের দেওয়া কর্মপত্রে বা ওয়ার্কশীটে প্রয়োগ করে তাদের এই দূর-শিখনকে বাস্তবমুখি করা হয়।

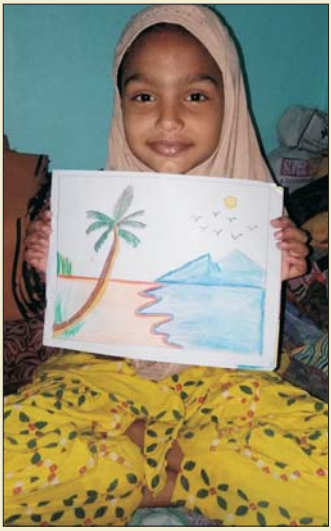

ঘরে বসে ছবি আঁকছিল বাচ্চারা

প্রতিমাসে প্রতীচী ট্রাস্ট ও টেক মাহিন্দ্রা ফাউন্ডেশন আয়োজিত নানা বিষয়ভিত্তিক বৈঠক, দৈনন্দিন ভয়াবহ পরিস্থিতির ফলে অবসাদগ্রস্ততা থেকে

আমাদের টেনে তোলে, ওঁরা আমাদের কর্মমুখি করে রাখেন এবং আমাদের মরচে-পড়া চেতনাকে লাগাতার চর্চায় রেখে, আমাদের উজ্জীবিত করে তোলেন। বিষয়গুলি ছিল— জাতীয় শিক্ষা নীতি ১৯৮৬, ১৯৯২, অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড, যশপাল কমিটি, জাতীয় পাঠক্রম ২০০৫, শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯, শিশুর সার্বিক বিকাশ, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা।

এভাবেই যথাসাধ্য প্রচেষ্টায় নানারকম পদ্ধতি প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ফল্গুধারায় এগিয়ে যাওয়ার উপায় বের করা হচ্ছিল। প্রথম দিকে কম সংখ্যায় হলেও, ধীরে ধীরে খুব কষ্ট করে বাবা-মায়েরা স্মার্টফোন কিনতে শুরু করলেন, সকলেরই মনের আশা তাদের সন্তানের শিক্ষা নিশ্চিত করা। আমরা শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজেরা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বাচ্চাদের নানা রকম কাজ দেওয়া শুরু করলাম। ভয়েস রেকর্ড করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সংযোগ রক্ষা করার ও শেখায় সহায়তা করার চেষ্টা করতাম। কারণ দিনের বেশিরভাগ সময়টাই মা-বাবা কাজে যান, তখন বাচ্চাদের ফোনে পাওয়া যাবে না, সবাইকে এক সঙ্গেও পাওয়া যাবে না যে Google Meet বা ঐ জাতীয় কোনো App ব্যবহার করে ওদের পাঠদান করা সম্ভব হত। এ বিষয়ে বাধাগুলি মোটামুটি এরকম--

১) স্মার্টফোন থাকলেও ইন্টারনেট কানেকশানে ন্যূনতম অর্থ ব্যয় করার সামর্থ্যও সবসময় সবার থাকে না।

২) একটি শ্রেণিতে সর্বোচ্চ ৫০শতাংশ বাচ্চার অভিভাবকের স্মার্টফোন আছে। তাই বাকিদের বঞ্চিত যাতে না হতে হয় সেদিকটাও খেয়াল রাখতে হবে।

৩) অধিকাংশ বাচ্চার দিদি, দাদা, ভাই-বোনেরাও ঐ একটি স্মার্টফোনের উপরে পাঠ গ্রহণের ব্যাপারে নির্ভরশীল। তাই সবাইকে শ্রেণিকক্ষের মতো একটি নির্দিষ্ট সময়ে পাওয়া সম্ভব নয়।

একইভাবে বাবা বা মা দিনের বেশিরভাগ সময়টা কাজে যান তখন শিক্ষার্থীরা স্মার্টফোন ব্যবহার করতে পারবে না তাই গুগল মীট বা গুগল ডুও-র মতো কোনো অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে শ্রেণিকক্ষের মতো পাঠদান এক্ষেত্রে সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। তাই বাধা অতিক্রম করে যথাসাধ্য পরিশ্রম ও চেষ্টায় আমরা কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছাতে পারলেও, সারা দেশে

লকডাউন শুরু হয়ে যাওয়ায় বাকি ছাত্রছাত্রীদের জন্য হাতে লেখা কর্মপত্র বা ওয়ার্ক শীটগুলি বানিয়েও আমরা তা তাদের কাছে সময়ে পৌঁছে দিতে পারিনি। মাসে একবারই মাত্র চাল আলু দেওয়ার সময়ে সেগুলি অভিভাবকদের হাতে তুলে দিতাম। কিন্তু, অনলাইন বা অফলাইন,উভয়ক্ষেত্রেই তারা কতটা তাদের পাঠ বুঝতে পারছে বা যে ব্লুমস ট্যাক্সোনমির উল্লেখ করেছিলাম, সেটি অনুযায়ী জ্ঞান, বোধ, মূল্যায়ন, পর্যবেক্ষণ স্তর পেরিয়ে বাস্তব প্রয়োগক্ষমতা আদৌ অর্জন করতে পারছে কিনা - সে ব্যাপারে অন্ধকারেই থেকে যাই। শ্রেণিকক্ষে ৩০-এর সামান্য বেশি বাচ্চা থাকলেও প্রত্যেকের মুখ দেখে সহজেই বুঝে যেতাম আজ ওদের মন কী চাইছে, মেঘলা দিনে কেমনভাবে তাদের মন আকাশপানে ছুটে যায়, কেমনভাবেই বা খেলতে খেলতে বা আপন মনে গান বা অভিনয়ের হাত ধরে অনায়াসে পাঠবিষয়কে আয়ত্ত করছে, তার সবটাই যেন নাগালের মধ্যে ছিল। ওদের চোখগুলি যেন কথা বলত, বলত তারা আগের দিন রাতে কি না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, বাড়ির পরিবেশ কি এমন ছিল, যাতে ওর মনখারাপ? তখন আগে শুরু হত মন ভালো করার উপায়, এবং সেই উপায় ধরেই চুপি চুপি পৌঁছে যাওয়া হত পাঠক্রমে। কিন্তু এভাবে দূর-শিক্ষার মাধ্যমে পূজার উপাচারটাই হচ্ছে, তবে শিশুগুলি কি সত্যিই তার ফল পাচ্ছে? মহার্ঘ্য ইন্টারনেট কানেকশনও সবসময় তারা ক্রয় করতে পারছে না, ফলে বাড়ছে হতাশা। যাদের স্মার্টফোন আছে তাদেরও, যাদের নেই তাদেরও। নিজেকে সবসময় অপরাধী মনে হচ্ছে। নিজের অজান্তেই শিক্ষিকা হিসাবে আমি যেন বৈষম্যের আয়োজন করছি।

এভাবে চলার মাঝে এল বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় 'আমফান'। একে তো ছিল তাদের ঘরবন্দি অস্বাস্থ্যকর জীবন। একটি ছোট ঘরে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে ১০-১২ জনের বাস। আমফানে তা আরো দুর্বিষহ হয়ে দাঁড়াল। বারো ঘর এক উঠোনে বসবাসকারী শিশুদের সবার সঙ্গে ব্যবহার করা কলঘরটিও দূষিত জলে থই থই। কোথায়বা দূরত্ববিধি কোথায়বা স্বাস্থ্যবিধি। ঘরের মাথার চাল উধাও। বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন। সর্বোপরি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ফোনগুলির কানেকশনও নেই। দিন পনেরো বা কুড়ি খুব উদ্বেগে কেটেছে। কেমন আছে আমাদের ক্ষুদে পড়ুয়ারা? স্থানীয় শিক্ষক-শিক্ষিকারা যেমন যেমন খবর দিতে পারতেন যে, বাচ্চারা সুরক্ষিত আছে, তখনকার মতো একটু নিশ্চিন্ত হতাম।

পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে অভিভাবকেরা একে একে যোগাযোগ করতে

থাকেন এবং শিক্ষার্থী অভিভাবক একযোগে বলতে থাকেন যে, দিদি প্রতি বছরের মত এই বছর রবীন্দ্রজয়ন্তী হবে না? তখন আমরা ঠিক করলাম ভার্চুয়াল মাধ্যমে যতজনকে পাব, তাদের নিয়েই রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করব। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের উৎসাহে অবাক হয়েছি, যারপরনাই আনন্দিত হয়েছি। যে বাচ্চার স্মার্টফোন নেই, সেও যখন ফোন করে বলে ''আন্টি, তুমি যে নাচ গান শিখিয়েছিলে আমার সব মনে আছে, একটু গাও না আমার সঙ্গে আমি মনে করে প্র্যাকটিস করি'' - তারপর কদিন বাদে দেখি যে সেই বাচ্চাটিই স্থানীয় ওষুধের দোকানে অনুরোধ করে আমারই শেখানো 'খরবায়ু বয় বেগে' গানটি নৌকার দাঁড় টেনে নাচতে নাচতে ভিডিও পাঠায় তখন আর চোখের জল ধরে রাখতে পারিনি। কেউ মায়ের হাত ধরে মায়ের কাজের বাড়ির কাউকে অনুরোধ করে, কেউ বা পাশের বাড়ির কলেজে পড়া দিদিকে অনুরোধ করে, নাচ বা গানের ভিডিও পাঠায়। একচিলতে ঘরে দাঁড়িয়ে নাচ দেখানোরও জায়গা নেই, তাতে কী! তক্তপোষেই কখনো হয়েছে স্টেজ, কখনো বা রাস্তার ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ক্ষুদে শিল্পীর নাচের ভিডিও-ও দেখেছি আমরা। কাছে থেকে একান্ত হয়ে যে নিবিড় অনুভূতি তাদের এতদিন শিক্ষায় ছিল, দূরে গিয়ে সেই অনুভূতি কতটা গাঢ় হলে এমন মরিয়া চেষ্টায় ফেলে আসা দিনের শিক্ষা নিয়ে এগোতে চাওয়া যায় তা দেখিয়ে দিয়েছে আমার শিক্ষার্থীরা। ওরা যেন এখন একলব্য হয়ে ওদের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে।

একই রকম আকুলতা স্বাধীনতা দিবস, বিদ্যাসাগর জন্মদিবস বা শিক্ষকদিবস উদযাপনেও চোখে পড়ে। একটা কথা বারবার বলব অভিভাবকদের আগ্রহ, উৎসাহ ও সহযোগিতা অপরিসীম। দীর্ঘ লকডাউনে শুধু আগের শেখানো গান বা নাচের স্মৃতি ছাড়াও পুরানো পাঠ পুনঃশিখনের প্রয়োজন। আমি ভিডিও-কল করে বাচ্চাদের নাচ শেখাচ্ছি, বাণী বা কবিতা মুখস্থ করাচ্ছি--- অভিভাবকেরা সেগুলি বারবার করে অভ্যাস করাচ্ছেন। সাজিয়ে গুজিয়ে ভিডিও তুলে পাঠাচ্ছেন। কুইজ-এর প্রশ্নোত্তর মুখস্থ করাচ্ছেন। একথা তাই বলতেই হয় যে, শুধুমাত্র প্রথাগত শিক্ষাই সব নয়, প্রায় অক্ষরজ্ঞানহীন বাবা-মায়ের সন্তানের উন্নতির মরিয়া চেষ্টাটাই আসল। আর তখনই সমাজের কাছে উঠে আসছে একটা প্রশ্ন, দরিদ্র, আগ্রহী, মেধাবী এই শিশুগুলোকে বাধ্য করা হচ্ছে নাতো একটা চরম বঞ্চনার শিকার হতে? ওদের উন্নতির জন্য সরকারি তরফ থেকে কি এই দীর্ঘ লকডাউনে কোনো পরিকল্পিত ব্যবস্থাই করা যেত না, যে ব্যবস্থায় সুরক্ষাবিধি মেনেই আমরা শিক্ষাকর্মীরা সুবিন্যস্ত

পদ্ধতিতে সকল শিক্ষার্থীর একযোগে উন্নতিকল্পে কাজ করতে পারতাম? বেসরকারি বিদ্যালয়ে পাঠরত আপেক্ষাকৃত সচ্ছল শিক্ষার্থীদের যেমন শিক্ষা প্রয়োজন তেমনই দরিদ্র মেধাবী বা সাধারণ মেধা বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুরও শিক্ষা প্রয়োজন। শিক্ষা মৌলিক অধিকার। শিক্ষার অধিকার আইন কি তাহলে এই অতিমারিতে বিলুপ্ত হয়ে গেল? খুব চিন্তা ও কষ্টেই দিন কাটছে। অবসাদে ডুবে যাচ্ছিলাম যখন, তখনই দেখি প্রতীচী ট্রাস্ট-এর উদ্যোগে খোলা ''স্কুল অ্যাক্টিভিটিস'' নামে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে শিক্ষক-শিক্ষিকারা নানান নতুন নতুন পদ্ধতি বের করছেন। দিনের পর দিন নানা ওয়ার্কশীট বা হাতের কাজ তুলে ধরছেন। সেগুলি যাদের স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট কানেকশন আছে, তাদের পাঠাতাম। পাশাপাশি কাগজে লিখে রাখতাম— মনে অপরাধবোধ নিয়ে যে যাদের স্মার্টফোন বা ইন্টারনেট কানেকশন নেই, তাদের বঞ্চিত করছি, পরে কখনো তাদেরও এইগুলো দেব। এমন সময় এই গ্রুপে পথ দেখালেন শিক্ষিকা শ্রীমতী অলিম্পিয়া বড়ুয়া। তিনি লকডাউনের মধ্যেও বিশেষ অনুমতি আদায় করে ছাত্রছাত্রীদের বাড়ি পৌঁছেছেন। তাঁর ঐকান্তিক উদ্যোগে অত্যন্ত উৎসাহিত হলাম। আনলকপর্ব শুরু হতেই যেতে শুরু করলাম সেই সব মহল্লায়, যে শিশুদের কাছে এতদিন পৌঁছতে পারিনি। দূরত্ব বিধি ও মাস্ক, স্যানিটাইজার সমেত নিরাপত্তাবিধি বজায় রেখেই তাদের পূর্বপাঠগুলি কতটা মনে আছে , সেটা দেখে বুঝে শেখানোর নতুন উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। সবাইকে অনেক সময়েই বাড়িতে পাই না। এক তো একচিলতে ঝুপড়ি ঘরে স্থান সংকুলান হয় না— তাছাড়া বলতে দ্বিধা করার উপায় নেই, পেট বড় বালাই! দুমুঠো অন্নের সংস্থান করতে ওরা কেউ বা কাগজ কুড়তে যায়, কেউ শিশিবোতল কুড়িয়ে বিক্রি করে। অথবা কেউ মাছ, মাংসের দোকানে বঁটি নিয়ে বসে যায় দু-পয়সার রোজগারে। দিনে একবেলা নিশ্চিত পেট ভরার আর লেখাপড়া করার যে জায়গাটা সেটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই শৈশবেই তারা আছে রুজিরুটির সন্ধানে, অতিমারি উপেক্ষা করেও পথে পথে ঘোরে। মাসে ২কেজি চালের সঙ্গে ২কেজি আলু বা ১কেজি আলু ও ১কেজি ছোলা দিয়ে কি পেট ভরবে? শিশুশ্রেণির খুদেগুলো তো তা থেকেও বঞ্চিত! সপ্তাহে দু-দিন ডিম, সোয়াবিন বড়ি, মটরের সবজি এগুলি পেতো স্কুল খোলা থাকলে--- সেই বরাদ্দ পুষ্টি থেকেও বঞ্চিত ওরা সবাই।

এইভাবেই দিন কাটছে আমাদের অসম লড়াই করে। সবকিছুর পরও মনে বড় অশান্তি থেকে যায়। একটা প্রশ্ন ও চিন্তায় মনটা বড় অশান্ত হয়, সরকারি নিয়মে

স্কুল খোলার পর এই শিক্ষার্থীরা পরের ক্লাসে উঠে যাবে। কিন্তু ক্লাস ওয়ানের যে শিশুটি আমার হাত ধরে 'আ-কার ই-কার' করে রিডিং পড়া শিখত, ক্লাস টু-এ যুক্তাক্ষর শিখে গড়গড় করে রিডিং পড়ত, সমস্বরে একে অপরকে হাত ধরে গুনিয়ে অঙ্ক শিখত, চোখে দেখতে না পাওয়া যে শিশুটি আমার স্পর্শেই খুঁজে পেত নিরাপত্তা ও শিখে নেওয়ায় আগ্রহী হত তারা এই স্কুল বন্ধের সময় কতটা কী শিখছে? তাদের হাত ধরে শিখিয়ে দেওয়ার কেউ তো নেই? পরের ক্লাসে উঠে যাবে ঠিকই, কিন্তু ভিত কাঁচা থেকে যাবে না তো? ঘাটতি কীভাবে পূরণ হবে? যতই ফোনে পড়াবার চেষ্টা করি - তা যে অন্ধকারে হাতড়ানো - সেই সত্যিটা তো অস্বীকার করতে পারি না। তখন আলোচনা করতে থাকলাম পরিচিত শিক্ষকমহলে। এইভাবেই আমার অগ্রজ এক শিক্ষকবন্ধু, কলিকাতা অনাথ আশ্রমের শ্রী উৎপল মুখোপাধ্যায় একদিন একটি সুন্দর পরিকল্পনা দিলেন--- উৎসাহ দিলেন ওঁর সঙ্গে একজোট হয়ে কাজ করার। এইভাবেই লেগে পড়লাম কাজে। সঙ্গে থাকলেন শিশু শিক্ষা নিকেতন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রী দীপক রায়, গার্ডেন ফর চিলড্রেন বিদ্যালয়ের শ্রী শুচিব্রত গুপ্ত, পরেশনাথ বালিকা বিদ্যালয় প্রাথমিক বিভাগের শ্রীমতী সুতপা ঘোষ, শিশু শিক্ষা সদন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রীমতী বন্দনা রয় ঘটক, কমলা বিদ্যামন্দির প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রীমতী পাপিয়া দত্ত, কলিকাতা অনাথ আশ্রমের শ্রীমতী নন্দা সিনহা ও এহসান সাদাব কাদির। আমরা এই নয়জনের দল নানা কর্মশালা ও বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, পাঠক্রমকে লার্নিং আউটকাম-এর ভিত্তিতে ছোট করে তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ওয়ার্কশীট বা কর্মপত্র বানিয়ে সম্ভাব্য ৩০দিনও যদি আমরা কর্মদিবস হিসাবে ব্যবহার করি তাহলেই শিক্ষার্থীদের পরের শ্রেণির জন্য কিছুটা উপযুক্ত করা সম্ভব হবে। তৈরি হল 'সবুজ পাতা', যা ৫ই সেপ্টেম্বর শিক্ষকদিবসের দিন, কলিকাতা প্রাথমিক সংসদ সভাপতি শ্রী কার্তিক চন্দ্র মান্না মহাশয় অনুমোদনও করেন ব্যবহারের জন্য।

এবার অপেক্ষা এই অতিমারির প্রকোপ কমার, পুনরায় আবার সবার বিদ্যালয়মুখি হওয়ার, দিন গুনছি। এতদিন যাবৎ আপ্রাণ চেষ্টা করছি শিক্ষার্থীদের সুস্থ ও সুরক্ষিত রাখার। একই সঙ্গে মহামারি দুর্যোগ সামলে ওঠার মানসিক শক্তির জোগান দিয়ে তাদের মানসিক দিক দিয়ে পরিণত করার চেষ্টা করছি। আশা করছি এই মানসিক পরিস্থিতি বা বিকাশ, ওদের পরবর্তী পাঠক্রম অনায়াসে আয়ত্ত করার সাহায্য করবে। শুষ্ক কঠিন মাটিতে নেমে আসুক রোগ মুক্তির বৃষ্টি যাতে এই বঞ্চিত শ্রেণির পড়ুয়ারা বিকশিত হোক, পল্লবিত হোক।

আমাদের মত দরিদ্র দেশে যন্ত্রনির্ভর শিক্ষা আজও সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। তাই ধন্যবাদ জানাই প্রতীচী (ইন্ডিয়া) ট্রাস্ট ও টেক মাহিন্দ্রা ফাউন্ডেশনকে, আমাদের এই অসম লড়াই ও অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। শেষ করছি চির প্রাসঙ্গিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি দিয়ে---

‘‘বাইসাইকেলে চড়ে আমরা সহজেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি, কিন্তু বাইসাইকেল ভেঙ্গে পড়লে বুঝতে হয়, বহুমূল্য যন্ত্রের চেয়ে বিনামূল্যের পায়ের দাম বেশি। যে মানুষ উপকরণ নিয়ে বড়াই করে, সে আসলে জানে না যে কতটা গরীব, বাইসাইকেলের আদর কমাতে চাইনে, কিন্তু দুটি সজীব পায়ের আদর তার চেয়ে বেশি, সেটা আমাদের বুঝতে হবে। শিক্ষা জিনিসটা জৈব ওটা যান্ত্রিক নয়। কার্যপ্রণালীর চেয়ে প্রাণ ক্রিয়া প্রসঙ্গ সর্বাগ্রে।’’...

‘‘বই-এর পাতা অতিক্রম করে শিক্ষায় সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটাতে হবে। সকলের পাশে দাঁড়ানোর সমব্যাথী মানসিকতার সুস্থ মানুষ তৈরি লক্ষ্য থাকতে হবে।’’

শিশুশিক্ষার অনুশীলন ঃ ফুটপাতে, গঙ্গার ঘাটে, রেললাইনের ধারে

অলিম্পিয়া বড়ুয়া
রাজভবন অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় (শাখা ১)

গোড়ায় জানাতে চাই আমাদের বাস্তব অবস্থার কথা। বর্তমানে এই করোনা অতিমারি আবহে দীর্ঘ ৭মাস এবং আমফান পরবর্তী সময়ে আমাদের মতো বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য ও পাঠন পাঠনের গতিধারা সঠিকভাবে বজায় রাখার জন্য প্রতিনিয়ত এক কঠিন লড়াইয়ের সম্মুখীন হচ্ছেন।

তার মূল কারণ হল বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বেশিরভাগ পরিবারের সাথে দূর থেকে যোগাযোগ রক্ষা করে চলার কোনো মাধ্যম নেই, যার দ্বারা আমরা প্রতিনিয়ত তাদের খোঁজখবর সঠিকভাবে নিতে পারব। এই করোনা অতিমারির সময়ে যেখানে অনলাইন ক্লাসের পড়াশুনার উপরেই বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে, সেখানে আমরা তাদের কোনোরকম অনলাইন ক্লাস করাতে পারছিনা। আমাদের বিদ্যালয়ের 90% অভিভাবকদের কোনো ফোনই নেই। আর্থিক প্রতিকূলতার জন্যই অভিভাবকগণ প্রতিদিনের খাদ্যসামগ্রী জোগাড় করতেই যেখানে হিমশিম খাচ্ছেন, সেখানে ফোন তাদের কাছে বিলাসিতার সমান। এখানে আমি ‘‘হিমশিম খাচ্ছেন’’ শব্দ দুটি ব্যবহার করেছি কারণ যখন সারা ভারতব্যাপী সম্পূর্ণ লকডাউন চলছিল, সেই সময়ে রাজ্য সরকারের দেওয়া নির্দিষ্ট পরিমাণ মিড-ডে-মিল খাদ্যসামগ্রী পাওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই বেশ কিছু ছাত্রছাত্রীদের পরিবার আমার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন এবং এক করুণ আর্জি জানাতে থাকলেন যে, আরো কিছু খাদ্যসামগ্রী জোগাড় করে দেওয়ার জন্য। এই পরিবারগুলোর অভিভাবকগণ দৈনিক মজুরিতে বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত, যেমন— কেউ ভ্যানরিকশা চালান, কেউ গাড়িতে মালপত্র ওঠানো নামানোর কাজ করেন, কেউ অফিসপাড়ার বিভিন্ন অফিস ও দোকান পরিষ্কারের কাজে নিযুক্ত, আবার কেউ খাবারের দোকানে মশলা বাটেন, কেউ আবার কোনো মন্দির ও মসজিদের সামনে ভিক্ষাবৃত্তি

করেন। সুতরাং সম্পূর্ণ লকডাউনের ফলে তাঁদের রুজিরুটির ভীষণ টান পড়ে। সেইজন্য সম্পূর্ণ লকডাউন চলাকালীন ৩০শে মার্চ ২০২০ তারিখ, এবং তার কিছুদিন পরেও বেশ কিছু সংস্থা ও পরিচিত মানুষদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি কিছু খাদ্যসামগ্রী জোগাড় করে দেওয়ার জন্য। কারণ সেই মুহূর্তে খাদ্যের অভাব মেটানোর সঙ্গে সঙ্গে শিশুর শারীরিক বিকাশ এবং তার পরিবারের মানুষজনদেরও যাতে পুষ্টির অভাব না হয়, এবং তারা খাদ্যসামগ্রী জোগাড় করতে গিয়ে কোনো অপরাধমূলক কাজ করে না বসে, সেটা আমার কাছে খুব চিন্তার বিষয় ছিল। এই পর্যায়ে প্রতীচী (ইন্ডিয়া) ট্রাস্ট ও গুঞ্জ নামক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও এনজিও-র প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সম্পূর্ণ লকডাউন চলাকালীন এবং তার পরেও বিদ্যালয়ের অভিভাবকদের হাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় ও খাদ্যসামগ্রীসহ অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী তুলে দিতে পেরেছিলাম।

এবার আসি আজকের নির্দিষ্ট বিষয়ে। আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ‘‘পেডাগগি ইন প্র্যাকটিস ইন দ্য প্যান্ডেমিক টাইম’’। আলোচনার এই বিষয়ের সূত্র ধরে প্রথমেই আমি শিক্ষাবিদ ডিউই-এর একটি বক্তব্য দিয়ে শুরু করব, উনি বলেছিলেন— শিশুর বিভিন্ন সম্ভাবনাগুলির পূর্ণ বিকাশই হল শিক্ষার লক্ষ্য, অর্থাৎ যাকে আমরা বলি সামগ্রিক বিকাশ বা সর্বাঙ্গীন বিকাশ। আমরা জানি শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিশুকে সর্বাঙ্গীন বিকাশে সাহায্য করা। যেমন -- ১. শিশুর শারীরিক বিকাশ ২. বুদ্ধিগত বিকাশ ৩. সামাজিক বিকাশ ৪. প্রাক্ষোভিক বিকাশ ও ৫. নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ।

গত ৫ই সেপ্টেম্বর ২০২০ করোনা অতিমারি ও আমফান পরবর্তী সময়ে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকে আরও সুন্দর ও দৃঢ়ভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারি স্বাস্থ্যবিধি মেনে আমাদের বিদ্যালয়ের পরামর্শদাতা ডাক্তারবাবুর সহায়তায় অভিভাবকদের নিয়ে এই ‘‘করোনা অতিমারি’’ বিষয়ের সচেতনতার উপর এক আলোচনাভিত্তিক মায় প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম। গঠনমূলক আলোচনা, কিছু সংকট, বেশ কিছু সম্ভাবনা এই অনুষ্ঠানকে একটা কার্যকরী চেহারা দেয়। শেষে অনুষ্ঠানে খানিক ভিন্ন রং দিতে, যোগদানের অভিনন্দন জানাতে প্রত্যেকের জন্য পুরস্কারের আয়োজন করেছিলাম আমরা। এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করার কারণ হল আমার বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পরিবারগুলো এমন এক অঞ্চলে এবং এমন অপরিসর ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করেন, যেখানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে সুস্থতার সঙ্গে বসবাস করা প্রায় অসম্ভব। মূলত এই

অঞ্চলগুলো হল আর্মেনিয়ান ঘাট, বাবুঘাট, হাওড়া ফুলমার্কেট ও বি বা দী বাগের কিছু এলাকায়। এইসব অঞ্চলের পরিবারগুলোর বেশিরভাগ মানুষই প্রায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে স্বল্প পরিসরের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে বসবাস করেন। কেউ থাকেন খোলা আকাশের নীচে, কেউ ফুটপাথের উপর, আবার অনেকে থাকেন ব্রিজের নীচের কোনো পরিত্যক্ত অংশে, আবার কেউ রেললাইনের ধারে প্লাস্টিকের ছাউনিতে।

অভিভাবকদের সঙ্গে অতিমারিতে স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রসঙ্গে আলোচনা সভা

তাই আমরা পরস্পরের মধ্যে এক বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে ওই ধরনের পরিবেশে বসবাস করেও অভিভাবকগণ কীভাবে এই করোনা অতিমারি ও আমফান পরবর্তী সময়ে তাদের পরিবারের সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছেন তা জানতে চাই এবং সামগ্রিক ও নির্দিষ্ট জীবনযাত্রা আমাদের চোখের সামনে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। কোন কোন স্বাস্থ্যবিধির বিষয়গুলো আরো ভালোভাবে সচেতনতার সঙ্গে মেনে চলা উচিত, সেইসব স্বাস্থ্যবিধির নিয়মগুলো কিভাবে নিজেদের শিশুদের

সঠিকভাবে পালন করাতে হবে, যেমন -- মাস্ক পরার প্রয়োজনীয়তা, দূরত্ব বিধি মেনে চলা, সাবানের ব্যবহার, যথাযথ পুষ্টিকর খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা, অযথা অনেকে মিলে খেলাধুলা না করা প্রভৃতি নিয়মগুলো নিয়ে এক বিজ্ঞানভিত্তিক স্বাস্থ্যবিধির দিকগুলোও আলোচিত হয়েছিল।

আর এরই সাথে ওই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আরো এক বিশেষ বিষয় সম্পর্কে অভিভাবকগণ ও তাঁদের মারফত ছাত্রছাত্রীদের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেওয়া হয়, তা হল, এই করোনা অতিমারি আবহে কারোর প্রতি কোনো বিদ্বেষভাব তাঁরা যেন পোষণ না করেন ও করোনা রোগীর এবং তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে কোনোরকম খারাপ আচরণ না করেন এবং যতটা সম্ভব কোনো বিপদগ্রস্ত বা কোনো অভুক্ত ব্যক্তির দিকে যেন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। এই অনুষ্ঠান ও তার বার্তাটির মধ্য দিয়ে আমরা কেবল শিশুর শারীরিক বিকাশের দিকটিতেই নজর দিইনি। তার বুদ্ধিগত বিকাশ, সামাজিক বিকাশ, প্রাক্ষোভিক বিকাশ ও নৈতিক বিকাশের দিকটি আলোকপাত করাতে চেয়েছিলাম। সংকট পরিস্থিতি যেহেতু সমাজের গুরুত্বকে সবচেয়ে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেয়, সেহেতু আমাদের মনে হচ্ছিল, অতিমারির সংকটও শিশুর বুদ্ধিগত, সামাজিক, নৈতিক বিকাশে বাড়তি সাহায্য করবে, শিশুকে বুদ্ধি খাটিয়ে স্বাস্থ্যবিধি মানতে হবে, আবার তার দৈনন্দিনের কাজগুলিও করতে হবে। এর সাহায্যে, যুক্তি হোক বা কার্যকারণ সম্পর্কে বোঝাপড়া হোক, বিকশিত হবেই। একই সঙ্গে তাকে জানতে হচ্ছে যে সে একা বাঁচবে না, বাঁচবে গোটা সমাজের সঙ্গে, তাই এই পরিস্থিতির বিশেষ স্বাস্থ্যবিধি তাকে শেখাবে কেমন করে শারীরিক দূরত্ব সত্ত্বেও মানুষে মানুষে সামাজিক দূরত্ব বাড়ানো যায় না। আলোচনাসভার মূল উদ্দেশ্য ছিল এগুলোই, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই হাতে নিয়ে আমরা কাজ করতে পারছি না বটে, তবে জীবনযাপনকে যাতে পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই করে তোলা যায় তার চেষ্টা করছিলাম।

বাচ্চার বিকাশের প্রশ্নে নানা কাজ করার উদ্যোগ করেছি আমরা। একটি উদাহরণ সহযোগে বিষয়টির ব্যাখ্যা দিচ্ছি, শিশু শ্রেণি ও প্রথম শ্রেণিকে আমি বিভিন্ন গাছ সম্পর্কে একটু ধারণা দিয়ে একটি গাছ আঁকতে বললাম ও রং করতে বললাম। গাছ কেমন দেখতে হয় সেই সম্পর্কে তাদের যথেষ্টই পূর্বজ্ঞান রয়েছে। এইবার এই গাছের অঙ্কন, গাছের বিভিন্ন অংশে কোন কোন রং ব্যবহার করবে সেই সব নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা ও অঙ্কনের মধ্য দিয়েই আমরা শিশুটির নান্দনিক বিকাশ, সামাজিক বিকাশ, হৃদয়বৃত্তিক বিকাশ,

বুদ্ধিগত বিকাশ, ভাষার বিকাশের বিভিন্ন দিকগুলোর পরিকল্পিত নমুনা পেলাম।

এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যবইয়ের বিভিন্ন একক, যেমন দ্বিতীয় শ্রেণির ''আমার বই'' থেকে 'ঝুড়ি নামে মাটিতে' ও তৃতীয় শ্রেণির ''আমাদের পরিবেশ'' থেকে 'একটি গাছ অনেক প্রাণ' পাঠগুলো পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সাদা কাগজে একটি চারা গাছ ও একটি পূর্ণ গাছ জল রং দিয়ে এঁকে গাছ সম্পর্কে কয়েক লাইন লিখতে বললাম। এইভাবেও আমরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নান্দনিক বিকাশ, শারীরিক বিকাশ, সামাজিক ও হৃদয়বৃত্তিক বিকাশ, ভাষার বিকাশ ও বৌদ্ধিক বিকাশের পরিচয় পেলাম।

ওই একইভাবে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশ বই থেকে চতুর্থ শ্রেণির 'বিশনয়দের গল্প' ও পঞ্চম শ্রেণির 'পরিবেশ ও বনভূমি' পাঠ এককগুলি পড়ানোর সময় ছাত্রছাত্রীদের কোলাজের কাজের সাথে একটি পূর্ণ গাছ এঁকে তার বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করতে বললাম এবং খাতায় পরিবেশে গাছের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কয়েকলাইন লিখতে বললাম, এই পাঠ এককগুলির মধ্য দিয়েও আমরা ছাত্রছাত্রীদের ভাষার বিকাশ, নান্দনিক বিকাশ, বৌদ্ধিক বিকাশ, সামাজিক ও হৃদয়বৃত্তিক বিকাশ, শারীরিক বিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলোতে পৌঁছতে পেরেছি। পাশাপাশি সমূহ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করেই আমরা আমাদের বিদ্যালয়ের শিশুদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের সুফল লাভের আশায় এবং সমাজের মূল স্রোত থেকে যাতে তারা হারিয়ে না যায় তার জন্য ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যবইয়ের পড়া, টাস্ক, এবং আমাদের শিক্ষকদের নিজেদের উদ্যোগে তৈরি করা কিছু কর্মপত্রের কাজ নিয়ে আমরা সশরীরে পৌঁছে গেছি লকডাউনের সময় থেকেই। সপ্তাহের প্রায় ৫দিনই আমাদের ও পরিবারগুলির সময় সুযোগ অনুযায়ী কখনো সকালে, কখনোবা দুপুরে সঠিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে আগের উল্লেখিত অঞ্চলগুলোর বিভিন্ন ফুটপাথে, কখনো গঙ্গারঘাটে, আবার কখনো কোনো মন্দির ও চার্চের সিঁড়িতে, রেললাইনের ধারে এখনো যাচ্ছি। যেখানে পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনের সাথে সাথে মানসিক স্বাস্থ্যকে সুস্থ রাখার জন্য ও একঘেঁয়েমি থেকে মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ছবি আঁকা, পাঠ্যবইয়ের বিভিন্ন বিষয়ের উপর হাতের কাজ, কোলাজের কাজ প্রভৃতি এই বিষয়গুলোতে আমরা ভীষণভাবেই উৎসাহ দিয়ে চলেছি। আর এই বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করার প্রধান কারণ হল, যা শিশুর স্কুল

রেললাইনের ধারের বাসায় ছাত্র ও শিক্ষক

থেকে পায়, তা যেন এই অস্বাভাবিক অতিমারি পর্যায়ে বন্ধ না থাকে, সব সমস্যা সত্ত্বেও যেন তার শেখা না থমকে যায়।

উপরোক্ত এই বিষয়গুলো ছাড়াও আমরা ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যহ নিয়ম করে বিদ্যালয় শ্রেণিকক্ষে শেখানো বিভিন্ন যোগাসন ও গান চর্চার বিষয়েও তাদের উৎসাহ দিচ্ছি কারণ তারা যেন শারীরিক ও মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ থাকতে পারে। এর মধ্য দিয়েও আমরা শিশুর শারীরিক বিকাশ, বৌদ্ধিক বিকাশ, নান্দনিক বিকাশ ও প্রাক্ষোভিক বিকাশের সমন্বয় ঘটাচ্ছি।

আমি মনে করি শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ কেবল নিজের উপকারে আসে না, পাশাপাশি অন্যরাও অনুপ্রাণিত হন যাতে সামগ্রিক সুফল লাভ হয়।

এখনো পর্যন্ত আমি যে যে বিষয়গুলো উল্লেখ করলাম এবং আমরা

শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ তাদের কাজের মধ্যে দিয়ে যে যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছি, সেইসব কাজের প্রতি একটা সুন্দর ও সুচিন্তিত ধারণা তৈরি করে দেওয়ার জন্য প্রতীচী (ইন্ডিয়া) ট্রাস্ট ও টেক মাহিন্দ্রা ফাউন্ডেশন-এর অবদান অনস্বীকার্য। এই কথা বলার কারণ, সেই লকডাউনের প্রথম মাস থেকেই তারা আমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে ভার্চুয়াল সভা ও কর্মশালার মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যোগাযোগ স্থাপন করে চলেছে। বিভিন্ন সময়ে এই করোনা অতিমারির আবহে কীভাবে আমরা আমাদের সন্তানসম ছাত্রছাত্রীদের তাদের স্বাস্থ্যের ও পঠন-পাঠনের যত্ন নেব তার একটা সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত পরামর্শ দিয়েছেন। এই কঠিন সময়ে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েও আমাদের দিশেহারা হয়ে পড়তে হয়নি।

আমি ও আমাদের বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা এই প্রতিষ্ঠান দুটিকে ধন্যবাদ জানাই। সবশেষে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় কয়েকটা লাইন বলে আমার আজকের বিষয়ের বক্তব্য শেষ করব। কবিগুরু বলেছিলেন ‘শিক্ষা হল তাই যা আমাদের কেবল তথ্য পরিবেশনই করে না, বিশ্বসত্তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে।’

সংকটকালে নতুন দিশা

বর্ণালী সেনগুপ্ত
ভোলানাথ হালদার স্মৃতি প্রাথমিক

বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯)-এর প্রাদুর্ভাব শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্ন স্তরে এক ব্যাপক ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। এই সময়ে এই দীর্ঘ স্কুল বন্ধের ঘোষণা গোটা বিশ্ব জুড়ে সকল শিক্ষার্থীর উপর বিস্তর প্রভাব ফেলেছে। যদিও এই স্কুল বন্ধের মূল উদ্দেশ্য হল স্ব-বিচ্ছিন্নতা এবং সামাজিক দূরত্বের মাধ্যমে কোভিড-১৯-এর আরো সংক্রমণ রোধ করা। এই পরিস্থিতিতে আমাদের শুধুমাত্র এই ''স্কুল বন্ধ'' অবস্থার মোকাবিলা করলেই হবে না। কারণ বারবার আগত এই প্রাদুর্ভাব এবং শূন্যতার ভবিষ্যতের কারণে ভবিষ্যতের পরিকল্পনার প্রয়োজন। এই পরিকল্পনার ক্ষেত্রে একটি বহুপাক্ষিক পদ্ধতির আবশ্যক, যা শিক্ষাকে প্রভাবিত করে সামাজিক বৈষম্যগুলিকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া সমস্যার সমাধান করতে সহযোগী হবে।

বিদ্যালয় শিক্ষাস্তরের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ফর্মেটিভ ও সামেটিভ নামক যে মূল্যায়ন-নির্ভর পাঠদানের পদ্ধতি, তার সাময়িক পরিবর্তন। একই সঙ্গে শিশু মিশ্রিত-শিখনের মধ্যে দিয়ে যা শিখছে, বাস্তবে তার প্রতিফলন করতে পারছে কি না সে ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দিয়ে ভাবা। এই কাজের জন্য আমাদের পেশাদারি দক্ষতায় পাঠক্রমিক পরিকল্পনা ও কীভাবে শিশুকে শিখতে সাহায্য করা যায়, তার অনুশীলন করতে হবে। গবেষণা এবং আলোচনার মাধ্যমে একটা সাধারণভাবে মান্য উপায় বার করে, তা রূপায়ন করেই এই সংকটের সময়টিকে মোকাবিলা করতে হবে।

এবারে আমাদের স্কুলের ভৌগোলিক দিকটি নিয়ে বলি , স্কুলটি নগরভিত্তিক জেলা কলকাতার স্কুল হলেও, এখানে যে বাচ্চারা আসে তার মধ্যে ৯৯ শতাংশই আসে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার মহেশতলা অঞ্চল থেকে। এটি বিস্তীর্ণ একটি এলাকা, গোটা এলাকার নানা প্রান্তে ছড়িয়ে আছে বাচ্চাদের

ঠিকানা। ফলত আমাদের পক্ষে এই অতিমারি বা লকডাউনের সময় তাদের বাড়ি পৌঁছে যাওয়া সম্ভব হয়নি, উপরন্তু আমরা যে মোট নয়জন শিক্ষক, তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই দূর থেকে স্কুল এলাকায় আসেন। তাই নানা উপায়ে যোগাযোগ রাখার পরিকল্পনা করতে হয়েছে। স্কুলের মোট বাচ্চার ২০ শতাংশের কাছে আগে থেকেই স্মার্টফোন ছিল। বাচ্চাদের অভিভাবক-অভিভাবিকারা মূলত গৃহসহায়িকার কাজ করেন, এলাকার ছোট ছোট কারখানায় শ্রমিকের কাজ করেন, দোকানে কর্মচারির কাজ করেন। লকডাউনে পুরানো উপার্জন বন্ধ হওয়ায় তাঁরা সাময়িকভাবে কোনোক্রমে জীবিকা বদলে সংসার চালিয়েছেন। এই পরিস্থিতির আগেই আমরা একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করেছিলাম, যেখানে কীভাবে স্কুল চালানোর কথা ভাবছি, কীভাবে স্কুলের প্রশাসনিক, সামাজিক, বিদ্যাগত ও বাচ্চাদের অন্যান্য সামর্থ্য বিকাশের কাজগুলির প্রশ্নে উন্নয়ন করা সম্ভব, তা নিয়ে আলোচনা হত। এই গ্রুপে এলাকার নানা মানুষ ছিলেন। স্কুলবাড়ির আশেপাশের বাড়ির নানা মানুষজন যাদের বাচ্চারা হয়তো এই স্কুলে পড়েও না, কোনো বেসরকারি স্কুলে পড়ে, সেরকম বাড়ির বড়রা, এলাকার কেউ কাঠের কাজ করেন, বা বিদ্যুতের কাজ করেন, স্কুলের পার্শ্ববর্তী যে ক্লাবের মাঠ আমরা খেলার মাঠ হিসাবে ব্যবহার করি, সেখানকার সদস্য, সকলে ছিলেন এই গ্রুপে। বছরে নানা সময়ে এঁরা পাশে থেকেছেন, এমনকী আর্থিকভাবে সাহায্যও করেছেন, হয়তো কখনো কেউ মাইকের বা অটো প্রচারের জন্য যে খরচ তা বহন করেছেন।

লকডাউন কতদিনের, তা যেহেতু বোঝা যাচ্ছিল না, তাই শুরুতেই আমরা মোটামুটিভাবে একমাসের কাজ তৈরি করে বাচ্চাদের ও তাদের অভিভাবকদের হাতে দিয়েছিলাম। এক্ষেত্রে অবশ্যই উল্লেখ করতে চাই যে, আমাদের বাচ্চারা এবং অভিভাবকেরা পড়াশুনার প্রসঙ্গে যথেষ্ট সচেতন হয়ে উঠেছেন। পরবর্তী সময়ে উপরে লেখা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আমরা নানা কর্মপত্র বানিয়ে পাঠাতাম, ছবি আঁকা বা হাতের কাজও পাঠাতাম। যে ২০শতাংশের কাছে স্মার্টফোন ছিল তারা পেত, আর বাকিরা হয় সেগুলি পেত বন্ধুদের কাছ থেকে বা পাড়ার যদি কেউ গ্রুপে থাকেন, তাঁর কাছ থেকে। আবার ২০ শতাংশের কাছে কোনো ফোনই নেই। আক্ষেপ হল সব সত্ত্বেও ডিজিটালি, সাধারণ বা স্মার্টফোনের সাহায্যে মাত্র ৪০ শতাংশের কাছে কোনোমতে পৌঁছাতে পেরেছি, কিন্তু সংখ্যাগুরুই এই কাজগুলি পাচ্ছিল না।

দার্শনিক সক্রেটিস বলেছিলেন যে--- শিক্ষা একটি শিখার আগুন জ্বালানো নয়

বা একটি পাত্র ভরাট করাও নয়। মহান দার্শনিকের অভিমত ছিল--- সভ্যতার অগ্রগতিতে অবদান রাখতে নাগরিকদের শিক্ষিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

এই মহামারিটি ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ধাক্কা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে বলে মনে করি। সমগ্র শিক্ষানীতির এখনই পুনর্নির্মাণ প্রয়োজন। এই সময়কালে এই কাজ করে ফেলা আশু প্রয়োজন। এই পর্যায়ে সবটা অভিজ্ঞতা করে আমি মনে করি ডিজিটাল শিক্ষা ভবিষ্যতের একমাত্র পথ না হলেও, একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পথ হয়ে উঠতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন--- তাকেই বলি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা যা কেবল তথ্য পরিবেশন করে না..... যা বিশ্বের মঞ্চের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি শিক্ষার প্রথাগত কাঠামো পরিত্যাগ করে সমস্ত অস্তিত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যের মূল নীতিভিত্তিক পাঠক্রম তৈরি করেছিলেন। বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার জন্যও শিখন পদ্ধতি বেছে নেওয়া প্রয়োজন। কারণ শিক্ষক তো জ্ঞান দেওয়ার জন্য নন, সময়ে সময়ে শিক্ষার্থীকে নির্দেশনা দেওয়ার জন্যও। তার গন্তব্যে পৌঁছনোর জন্য তার নিজস্ব পথের দিশা দেখানোও হল শিক্ষকের কাজ।

প্রদত্ত পরিস্থিতিতে পাঠদান এবং শেখার পদ্ধতিতে সাহায্য করতে শিক্ষকদের বাচ্চাদের সঙ্গে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে একাধিক মাধ্যম গ্রহণ করা প্রয়োজন। পুরো সিলেবাস শেষ করার পরিবর্তে ন্যূনতম অপরিহার্য লার্নিং আউটকামগুলিকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। কলকাতার বা অন্যান্য জেলার আমার বহু বন্ধু শিক্ষকেরা ব্যক্তিগতভাবে বা দলগতভাবে সেই কাজ করছেন। আমাদের স্কুলে আমরা শিক্ষকেরা সপ্তাহান্তে বা পনেরো দিনে একবার ভার্চুয়াল সভা করে আমাদের কাজের দিশা ঠিক করি। তবে আমার মূল বক্তব্য হল, বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষকদের যে পরিকল্পনা সেগুলি ফলপ্রসু হতে পারে, তবু দরকার একটি মান্য ব্যবস্থার। আমাদের প্রায় সব শিক্ষকের কাছেই যেহেতু স্মার্টফোন রয়েছে তাই কেমন করে ডিজিটাল মাধ্যমে পড়াতে হয়, তার প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা দরকার। আমাদের স্কুলের সকল শিক্ষক একসঙ্গে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে একটি এনজিও-র সাহায্যে অনলাইন ক্লাসের মৌলিক বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নিয়েছি। যাতে পরে স্কুল খুললে সকলেই ডিজিটাল কাজে ভূমিকা নিতে পারি।

আজকের আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমি এই আবেদন করতে চাই যে, আমরা নিজেদের প্রস্তুত করতে চাই, আমরা কাজ করতে চাই। যেহেতু রাজ্য সরকারি শিক্ষা দপ্তরের ছাতার তলায় স্কুলগুলি রয়েছে তাই এমন একটা মান্য উদ্যোগ প্রয়োজন যাতে স্কুল খোলার আগেই নতুন করে পরিকাঠামো তৈরি করা যায়। স্কুল খুললেই যাতে বিনা কাল ব্যয়ে কাজ শুরু করতে পারা যায়, এমনিতেই অনেকটা সময় চলে গেছে। সরকারি স্কুলের সব শিক্ষকের অভিজ্ঞতা বলছে, ডিজিটাল মাধ্যমে শিক্ষা বেশিরভাগ বাচ্চার কাছে পৌঁছাচ্ছে না, তাই প্রত্যেকের কাছে যেন শিক্ষা পৌঁছায়, সেকথা মাথায় রেখে সত্বর নতুন পরিকাঠামো আনতে হবে। অতিমারির মধ্যে আমফান ঝড়ে আমাদের স্কুলের একটি অংশের চাল ও জলের ট্যাঙ্ক উড়ে গেছে, সেইটিও এই স্কুল বন্ধ থাকাকালীনই ঠিকঠাক করার উদ্যোগ করতে চাই, যাতে কোনো কাজ স্কুল খোলা অবধি পড়ে না থাকে। শিক্ষার নীতির যে আধুনিক হওয়া প্রয়োজন তা নতুন করে বলতে হয় না। খেয়াল রাখা দরকার অলস সময়ধারা বেয়ে মন যেন শূন্যপানে চেয়ে বা বয়ে না যায়। সংকট এসেছে, ভবিষ্যতেও বারবার আসতে পারে, তার মানে কি সংকটকালে শিক্ষাসংক্রান্ত কাজ সব বন্ধ হয়ে যাবে? কেবল ত্রাণ দিলেই বা দান করলেই হবে না, প্রত্যেকে যাতে নিজে সংকট সামলাতে পারেন তেমন ব্যবস্থাও করতে হবে। সেক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতার প্রশ্নে শিক্ষা হল অপরিহার্য উপায়।

প্রাথমিক শিক্ষার হাত ধরে শিশুর সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে যেগুলি আমাদের মূল পদ্ধতি ছিল যেমন স্পর্শ, ভালোবাসা, সহানুভূতি, দলগত শিক্ষা--- তার সবটাই এখন আমাদের অন্যভাবে ভাবতে হবে। এই অন্যভাবে ভাবার সময় খুব সতর্ক থাকতে হবে--- এমন যেন না হয় যে ডিজিটাল ডিভাইস হল, তার মাধ্যমে পড়ানোর নতুন পরিকাঠামো হল, কিন্তু শিশুর সামাজিক, প্রাক্ষোভিক, নৈতিক বিকাশের দিকটি নজর এড়িয়ে গেল। সতর্ক থাকতে হবে যাতে ভালবাসা, সহানুভূতি এবং মূল্যবোধের পাঠ থেকে শিশু বিচ্যুত না হয়।

মূলত আমাদের কাছেই শিশুর প্রথম পাঠ শুরু হয়। বাড়ির, মায়ের ওম ছেড়ে সে এসে সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে আমাদের হাত ধরে, আজকের এই সামাজিক দূরত্বের বাধ্যবাধকতায় কীভাবে শিশুর কাছে স্বস্তির হয়ে উঠব তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছি। তবে এও আশা করছি এই সংকট কেটে যাবে।

যখন ছাত্ররা স্কুলে ফিরবে

দীপক রায়
শিশু শিক্ষা নিকেতন

আজকের আলোচনার প্রসঙ্গ হল 'পেডাগগি ইন প্র্যাক্টিস ইন দ্য প্যান্ডেমিক টাইম'। আমি এবং আমার বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা কীভাবে এই অতিমারির দিনগুলিতে কাজ করেছি তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করছি। আমাদের স্কুলে যেসব শিক্ষার্থীরা পড়ে, তারা আসে মূলত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, সন্তোষপুর, ঢাকুরিয়া, গড়ফা অঞ্চল থেকে, আবার অভিভাবকদের কাজের সূত্রে, অনেকে আসে সোনারপুর, নরেন্দ্রপুর থেকেও। বেশিরভাগেরই আর্থসামাজিক অবস্থান নিম্নবিত্ত শ্রমজীবি সম্প্রদায়ভুক্ত। ১৪ই মার্চ ২০২০-তে শিক্ষার্থীদের স্কুলে আসা বন্ধ হয় এবং ২৫শে মার্চ থেকে সম্পূর্ণ লকডাউন হয়। ঠিক এই সময়ের মাঝখানে আমরা স্কুলের সব শিক্ষক-শিক্ষিকারা মিলে একটি মিটিং করি, কীভাবে এই পরিস্থিতিতে বাচ্চাদের সঙ্গে সংযোগ রাখা যায় তার একটা পরিকল্পনা করা হয়। তখন আমরা বাংলা শিক্ষা পোর্টালের সাহায্য নিয়ে প্রত্যেক ক্লাসের জন্য একটা করে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলি, যাতে তার মাধ্যমে আমাদের ভাবনা চিন্তাগুলি বাচ্চাদের সঙ্গে আদানপ্রদান করা যায়। মোটামুটি এপ্রিলের প্রথম থেকে সব গ্রুপগুলি চালু হয়ে যায়। কিন্তু দেখা যায়, মোট শিক্ষার্থীর ৬০শতাংশ এই গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছে, বাকিরা পারেনি। আবার অনেকের ফোন নম্বর ভুল, কারো বা স্মার্ট ফোন নেই, কিংবা কানেকশনের খরচের অভাবে হয়তো কারো বন্ধ হয়ে গেছে। তাহলে যারা যুক্ত হতে পারল না তাঁদের আমরা কীভাবে সাহায্য করব? তখন আমরা গ্রুপের অন্য অভিভাবকদের মারফতে যারা যুক্ত হতে পারেনি তাঁদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম। কিছু অভিভাবক ছিলেন যারা নিজেরাই দায়িত্ব নিলেন আশেপাশে যে বাচ্চারা আছে, আমরা যে কাজ বা নির্দেশ দেব, সেগুলি তাদের দিয়ে করিয়ে নেবেন। আবার যাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর নেই তাদের বলা হল, আশেপাশের

পাড়াতুতো কোনো কাকা, দাদা বা দিদির ফোন নম্বর দিতে। আমাদের কথা শুনে অনেকেই এটা করেছিল তাই মোটামুটি গ্রুপগুলো চালু হল। এইভাবে একটি অসম ব্যবস্থাপনার মধ্যে দিয়ে শুরু হল আমাদের প্যান্ডেমিকের পঠনপাঠন। বুঝতে পারছি যে, সব বাচ্চাকে ধরতে পারছি না, তবুও আমাদের কিছু করার নেই বা করার ছিল না। যেখানে প্রাইভেটে স্কুলগুলি বিভিন্ন আধুনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে, সেখানে এইটুকু না করলেই নয়। মনে মনে খালি ভাবনা, বাচ্চাদের ধরে রাখতে পারব তো, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারব তো। সমাজের শিক্ষিত উচ্চশ্রেণির মানুষজন আমাদের মতন সরকারি স্কুলগুলির উপর বিশ্বাস না রাখলে কোনোদিনই এই স্কুলগুলির উন্নতি হবে না, স্কুলে পিছিয়ে পড়া বাচ্চাদেরও উন্নতি হবে না, বাচ্চাদের অভাবে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনাটাই আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাবে। এই বিশ্বাস আদায় করার দায় ও দায়িত্ব দুটোই আমাদের।

যাই হোক, প্রথম দিকে শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়েরই তুমুল উদ্দীপনায় গ্রুপের কাজ শুরু হল। প্রথম প্রথম পাওয়ার পয়েন্ট করে সেটাকে ভিডিও করে গ্রুপে আপলোড করা হত, যদিও আপলোড হতে প্রচুর সময় লাগত, তাছাড়া ভয়েস রেকর্ড করে কীভাবে ধ্বনি বিশ্লেষণের সাহায্যে সরব পাঠ করতে হয় তার নমুনা পাঠানো হত, বাচ্চাদের বলতাম--- তোমরাও এভাবে পাঠ করে ভয়েস রেকর্ড করে পাঠাও--- বিভিন্ন কর্মপত্রও দেওয়া হত, তাছাড়া বিভিন্ন পালনীয় দিনগুলিতে বাচ্চারা নিজেরা পারফরমেন্স করে ছবি তুলে বা ভিডিও করে

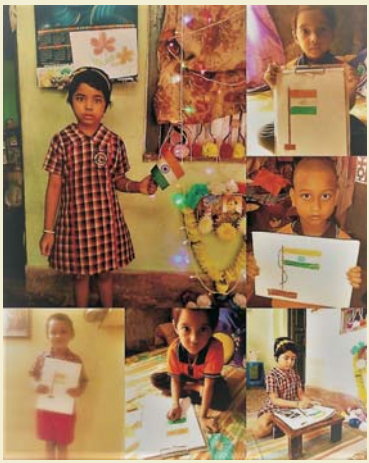

কখনো ছবি এঁকেছে বাচ্চারা, কখনো বা কাগজ কেটে হাতের কাজ করেছে

পাঠাত। চলছিল বেশ প্রথমদিকে! এই উৎসাহ উদ্দীপনায় আমাদের বা বাচ্চাদের কারোরই ঘাটতি ছিল না, বাচ্চারাও খুব উৎসাহিত হয়ে কাজ পাঠাত। এই ভাবেই প্রথম ২/৩ মাস চলল। খুবই দুঃখের বিষয় যত দিন এগোতে থাকল তত উপস্থিতি কমতে থাকল। তার একটা কারণ ছিল, মাঝখানে আমফানের সময় অনেকেই বিভিন্ন জায়গায় শিফট হয়ে গেল, কেউ কেউ ডেটা কার্ড ভরাতে পারেনি। ফলে একটা ছেদ পড়ল কাজে। এরপর যে সবাই উৎসাহের সাথে গ্রুপে ফিরে এসেছে এমনটি বলা যায় না। তাছাড়া কেন জানি না, ধীরে ধীরে আমরাও এই ব্যবস্থার প্রতি উৎসাহ হারাচ্ছিলাম। এভাবে সাধারণ ক্লাসের বদলে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে পড়ানো আর কত দিন চলবে? বাচ্চারাও যেন একঘেয়েমির কারণে উৎসাহ হারাচ্ছে। এমনকি অনেক অভিভাবক এভাবেও বলেছেন যে, আপনাদের পাঠানো কাজ আমরা বাড়িতে করিয়ে নিচ্ছি আর পাঠাচ্ছি না। এখন তো বাচ্চাদের গ্রুপে সাড়া কমতে কমতে ১৫-২০শতাংশে ঠেকেছে। এটা আমাদের শিক্ষকদের কাছে মানসিকভাবে খুবই যন্ত্রনাদায়ক, একে তো আমরা সকলকে আনতে পারিনি এই ব্যবস্থার মধ্যে, তারপর যাদের এনেছি তাদেরকেও ধরে রাখতে পারছিনা।

যাই হোক, আমাদের তো থেমে থাকলে চলবে না, এই অতিমারি পরিস্থিতির পর কীভাবে সমস্ত বাচ্চাদের ঘাটতিগুলি কিছুটা পূরণ করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে কলকাতার কিছু স্কুলের আমরা কয়েকজন বন্ধুস্থানীয় দাদা-দিদি শিক্ষক-শিক্ষিকারা মিলিত হয়ে একটি পরিকল্পনা করলাম। লক্ষ ৩০ থেকে ৩৫টি ক্লাস, অর্থাৎ যদি প্রতিমাসে আমাদের কাজের দিন ২২-২৩টি ধরে নিই, তাহলে পরের শিক্ষাবর্ষে প্রথম দেড়মাস থাকুক এই ঘাটতি পূরণের জন্য বা রিক্যাপিচুলেসনের জন্য। এখন প্রতিটি শ্রেণির প্রতিটি বিষয়ে কিছু 'লার্নিং আউটকাম' আছে। যেগুলির মধ্যে এমন কিছু 'লার্নিং আউটকাম' আছে, যেগুলি না শিখলে পরবর্তী শ্রেণিতে সেই বিষয়টির সাথে শিক্ষার্থীরা ঠিকমতন সংযুক্ত হতে পারবে না, সংযোগ স্থাপন করতে পারবে না। এরকমই কিছু 'এসেনশিয়াল লার্নিং আউটকাম' খুঁজে নিয়ে তার উপর আমরা 'লার্নিং ওয়ার্ক শীট' তৈরি করা শুরু করলাম। কিছু উদাহরণ দিলে বিষয়টি ধরতে পারবেন, যেমন দ্বিতীয় শ্রেণির গণিত, তার 'এসেনশিয়াল লার্নিং আউটকাম'-গুলি হল--- ১ থেকে ১০০ সংখ্যা পরিচিতি, দলগঠন, টাকা-পয়সা, তুলনা করা, গাণিতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ, জ্যামিতিক চিত্র, এরকম মোটামুটি নয়টি। এগুলির প্রত্যেকটির উপর তিন থেকে চারটি করে ওয়ার্ক শীট

তৈরিকরলে দাঁড়াবে প্রায় ৩২ থেকে ৩৫ টি, প্রতিটি ওয়ার্ক শীট-এর জন্য একটি করে ক্লাস বরাদ্দ। এরকমভাবে আমরা প্রত্যেকটি ক্লাসের প্রতিটি বিষয়ের উপর ওয়ার্কশীট তৈরি করা শুরু করলাম। প্রত্যেকটা বিষয়ের কিছু আলাদা আলাদা কৌশল নেওয়া হয়েছে। যেমন ধরুন, আমাদের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পরিবেশ বই যেভাবে সাজানো হয়েছে তা সম্পূর্ণ প্রোজেক্ট বা আবিষ্কারমূলক পদ্ধতিতে পড়ানো উপযোগী। কিন্তু এর জন্য সময় লাগবে অনেক, যা রিভিসন লেসেন হিসাবে করতে হলে অসুবিধা হতে পারে। তাই পরিবেশের মূল ভাবনাগুলোকে প্রথমে নির্বাচন করা হল, যেমন তৃতীয় শ্রেণিতে শরীর, খাদ্য, পোশাক, ঘরবাড়ি, পরিবার, জীবিকা, আকাশ, সম্পদ ও সাবধানতা এরকম নয়টি। তার উপরে বইতে যে মূল কথাগুলি লেখা আছে (মেজেন্টা বা সায়ান রঙে) সেগুলি নিয়ে ছোট ছোট কমপ্রিহেনশন বা টেক্সট তৈরি করা হল, সঙ্গে তৈরি হল হাতে কলমে কাজ করার জন্য ওয়ার্কশীট। এই ওয়ার্কশীটগুলি করতে করতেই শিক্ষার্থীরা বিষয় সম্পর্কে ধারণা গঠন করবে। বাংলা বা ইংরেজির ক্ষেত্রে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কিছু থিম রয়েছে, যেমন— তৃতীয় শ্রেণির বাংলা যদি ধরি, তাতে রয়েছে নিজের কাজ, ছবি, নদী, পর্যটন, গাছ, দেশ ইত্যাদি। এর থেকে দু-একটা গল্প বা কবিতা নিয়ে সেগুলিকে ছোট করা হয়েছে এবং তার ওয়ার্কশীটে টেক্সচুয়াল গ্রামার রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ক্ষেত্রে লেটার থেকে ওয়ার্ড, ওয়ার্ড থেকে সেন্টেন্স, সেন্টেন্স থেকে ফ্রেজেজ--- এইভাবে সাজানো হয়েছে। আবার দ্বিতীয় শ্রেণিতে যুক্তবর্ণের ধারণা দিতে সহজ পাঠের গল্পগুলিকে সংক্ষিপ্ত রূপে দেওয়া হয়েছে। আর সবক্ষেত্রেই শেষে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট রাইটিং-এর সুযোগ রাখা হয়েছে। এইরকম বিভিন্ন কৌশল বা পন্থা অবলম্বন করে আমরা পাঠ্যসূচির একটা ছোট্ট রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এখন আশা রাখি যে, এইভাবে আমরা যে লার্নিং ওয়ার্কশীটগুলো তৈরি করেছি, তা একটা ব্রিজের সৃষ্টি করবে দুটি শ্রেণির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য এবং এগুলি শিক্ষার্থীরা স্বল্প সাহায্যে বা নিজে নিজেই করতে পারবে। পুরোপুরি যে সফল হয়েছে তা বলা হচ্ছে না এখনো। প্রায় 80% এর মত কাজ হয়েছে, এখনো অনেক কাজ বাকি। 'সহজ পাতা' নাম দিয়ে এই কাজ আমরা ৫ই সেপ্টেম্বর ২০২০-তে আমাদের জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতির হাতে তুলে দিয়েছি। পরবর্তীকালে এই কাজগুলির আরো পরিবর্তন, পরিবর্ধন প্রয়োজন। সেই নিয়ে চিন্তা ভাবনা রয়েছে আমাদের। এখন আমরা চেষ্টা করছি আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে এই ওয়ার্ক শীটগুলি পরের শিক্ষাবর্ষের প্রয়োগ করতে। কিন্তু এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়

বাধা হল কাজের খরচ। কারণ এগুলি ছাপাতে খরচ প্রচুর। এখন আমরা চিন্তা ভাবনা করছি আমরা যে কম্পোজিট গ্রান্ট পাই, তা থেকে কিছু অংশ নিয়ে, এতে খরচ করা যায় কিনা। আরেকটা বিষয় সম্পর্কে অনেকে অভিমত দিয়েছেন যে, পরের শিক্ষাবর্ষে বাচ্চাদের স্বাস্থ্যের জন্য কম্পোজিট গ্রান্টের ১০ শতাংশ-এর বদলে ২০ শতাংশ খরচ করা যায়, তাহলে অনেকটা সুবিধাজনক হয়।

আর একটি বিষয় বলে আমি শেষ করব, এই অতিমারি অধ্যায়ে আমাদের স্কুলের বড়দি ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু খাদ্যসামগ্রীর ব্যবস্থা করেছিলেন। এতে উপকৃত হয়েছে আমাদের স্কুলের বেশ কিছু শিক্ষার্থী, যাদের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ, বাড়িতে একাধিক ভাই-বোন রয়েছে, শুধুমাত্র স্কুলের মিড-ডে-মিলের সামান্য চাল আলু ছোলায় বাচ্চাদের সংস্থান হচ্ছে না, সেই রকম কিছু পরিবারদের প্রথম তিন থেকে চার মাস খাদ্যসামগ্রী দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম। আমাদের স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও এর জন্য ফান্ড তৈরি করেছিলেন। এইসব ছোট ছোট ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে আমরা চেষ্টা করেছি বা এখনো করে চলেছি আমাদের স্কুলের প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীদের পাশে থাকার। আশা করি এই বিষন্ন দিনগুলি আমাদের জীবন থেকে মুছে যাবে, আমরা আবার ফিরে পাব আমাদের রোজকার অভ্যাস, রোজকার বিদ্যালয়, রোজকার শিক্ষার্থীদের সান্নিধ্য।

জাতীয় শিক্ষা নীতি (২০২০)-র ফাঁকফোঁকর

সুতপা ঘোষ
পরেশনাথ বালিকা বিদ্যালয় (প্রাথমিক)

এই অতিমারির সময়ে ৩০শে জুলাই ২০২০ কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় শিক্ষা নীতি জনগণের সম্মুখে উপস্থিত করলেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর এটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় শিক্ষানীতি। ১৯৬৮ ও ১৯৮৬-র পর ১৯৯২ সালের পরিমার্জিত নীতি, অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড কর্মসূচি, জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ ও শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ প্রণয়ন হয়েছে। প্রত্যেকটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তাৎপর্যপূর্ণ। এরপর জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ বেশ আশার আলো নিয়ে এল আমার কাছে। শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী ৬ থেকে ১৪ বছর বয়স অবধি সব বাচ্চাদের বিনাব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইনত স্বীকৃত ছিল। জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ অনুযায়ী এই বয়সসীমা বেড়ে হল ৩ থেকে ১৮ বছর। যদিও এটি এখনো আইনে রূপান্তরিত হয়নি, আইনত এই সীমা ৬ থেকে ১৪ বছরই রয়েছে, তবুও এটা খুব খুশির খবর আমাদের মতো প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য। একেবারে ৩ বছর বয়স থেকে শিশুর সবরকম বিকাশ যেমন শারীরিক, বুদ্ধিগত, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, নান্দনিক, নৈতিক বিকাশে সঠিকভাবে সহায়তা করার দায়িত্ব আমরা নিতে পারব।

কিন্তু যখনই জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ খুঁটিয়ে পড়ছি, তখন বেশ কিছু জায়গায় দেখলাম ফাঁক দেখা যাচ্ছে। এর দু-একটিতে আলোকপাত করতে চাইছি আজকের আলোচনায়— জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০-র ২.৯ ক্রমাঙ্কে বলা হয়েছে যে, ৩ বছরের শিশু মিড-ডে-মিল এবং সকালের খাবারও পাবে। এটি খুবই আনন্দের কথা, কারণ এতদিন মিড-ডে-মিল কেবল ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সেই আটকে ছিল। একই স্কুলে প্রাক-প্রাথমিক বিভাগ থাকা সত্ত্বেও, সেই বিভাগের বাচ্চাদের মিড-ডে-মিল দেওয়ার সুযোগ আমাদের ছিল না। ফলে শিশুর পুষ্টির প্রশ্নে নতুন নীতির এই প্রস্তাবটি উপযোগী। কিন্তু মিড-ডে-মিল

সংক্রান্ত চিরায়ত সমস্যা তার জন্য বরাদ্দ খরচের পরিমাণকে ঘিরে। শিক্ষানীতি আইন না হলেও, তা আইনকে দিশা দেয়। তাই এই চিরায়ত সমস্যার সমাধানের উল্লেখ নীতিতে থাকা উচিত ছিল। খাবারের পরিমাণ এবং তার গুণগত মানের প্রসঙ্গটি যেহেতু পুষ্টির সঙ্গে জড়িয়ে এবং বরাদ্দ খরচের চিরায়ত অন্যায্যতা যে পুষ্টিকে সুনিশ্চিত করতেই দূর করতে হবে, সে কথা নীতিতে না থাকলে, তা অবশ্যই নীতিটির ত্রুটি। এই মুহূর্তে যা চলছে তার ব্যাপক মানোন্নয়ন যে অবশ্য প্রয়োজনীয় তার উল্লেখ নীতিতে না থাকা ফের একটি সম্ভাব্য দায়সারা বন্দোবস্তকে ইঙ্গিত করে। আমরা জানি পুষ্টিকর খাদ্য শিশুর সার্বিক বিকাশে কতটা প্রয়োজন। খাদ্যে নিয়মিত প্রাণীজ প্রোটিন, শর্করা, ফ্যাট, ভিটামিন, মিনারেল থাকা দরকারি। গোটা অতিমারি পর্যায়ে মিড-ডে-মিলে এ রাজ্যে ২কেজি চালের সঙ্গে মাত্র ২কেজি আলু বা ১কেজি আলু ও ১কেজি ছোলা দেওয়া হচ্ছে। অবাক লাগে এই অবিবেচক সিদ্ধান্ত দেখে! জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০-তে আরো একটি বিষয় চোখে পড়ল, যেখানে বলা হচ্ছে— যেখানে রান্না সম্ভব নয় সেখানে অন্য শুকনো খাবার দেওয়া হবে। এটা একটা ফাঁক, কারণ রান্না করার সুবিধা নেই এটা একটা অদ্ভুত ভাবনা। এদেশে কোনো স্কুল এমন কোনো দুর্গম অঞ্চলে অবস্থিত হয় না, যে সেখানে রান্নার সুবিধা থাকবে না। মিড-ডে-মিল হল গরম রান্না করা খাবার। কারণ সেটিই স্বাস্থ্যসম্মত। শুকনো খাবার বাসি হওয়ার বা অস্বাস্থ্যকর হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই এই কর্মসূচির নাম কুকড মিড-ডে-মিল প্রোগ্রাম। পুরানো এই শর্তকে বদলে দেওয়া কখনোই শিশুর পক্ষে শুভ কিছু না।

দ্বিতীয়ত, ১.৭ ক্রমাঙ্কে যে বিষয়টি আমার আপত্তিকর ঠেকছে তা হল, তিন বছর বয়সি শিশুরা নিজেদের বাসস্থানের কাছাকাছি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে যাবে সেখানে তারা মিড-ডে-মিল খাবে এবং পড়াশোনা প্রথম ধাপ অক্ষর জ্ঞান, সংখ্যা ধারণা এবং অন্যান্য প্রারম্ভিক বোধের বিকাশের সুযোগ পাবে। আবার বলা হয়েছে যে শিক্ষক নিয়োগ হবে অঙ্গনওয়াড়ির কাছাকাছি ছেলেমেয়েদের মধ্যে থেকে, যাঁরা মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক স্তর পেরিয়েছেন,তাঁদের মধ্যে থেকে। মাধ্যমিক উত্তীর্ণদের জন্য বারো মাসের ও উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণদের জন্য ছয় মাসের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, এবং এই প্রশিক্ষণ হবে অনলাইনে। কীভাবে ছয় বা বারো মাসের প্রশিক্ষণ অনলাইনে দিয়ে একজন দক্ষতা সম্পন্ন শিক্ষক তৈরি করা সম্ভব তা বোঝা যায় না। যেখানে আমরা জানি একজন শিক্ষককে প্রশিক্ষণের সময় কত ধরনের এক্টিভিটি করতে হয়। প্র্যাকটিস টিচিং,

ফাইনাল টিচিং এসব কীভাবে হবে অনলাইনে? প্রাক প্রাথমিক স্তরের জন্য মন্তেসরি প্রশিক্ষণের মতো যে ধরনের প্রশিক্ষণ আছে, অনলাইনে কীভাবে তেমন করে শিক্ষকের দক্ষতা বাড়ানো সম্ভব? এই শিক্ষকদের পদটি ঠিক কী হবে তা স্পষ্ট করে বলা নেই। এঁরা স্থায়ী শিক্ষক হবেন না কি স্বল্পকালীন কিছু, তা বলা নেই? এটি পড়ে, অল্প অন্যায্য বেতনে কম সময়ের জন্য শিক্ষক নিয়োগের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে , এই প্রবণতা আমরা আগেও দেখেছি বহুবার। এতে করে কেবল শিক্ষাব্যবস্থাকে অনিশ্চিত করা হয় না, এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে শিক্ষকের শ্রমের যোগ্য মূল্য না দেওয়ার ধারাবাহিক অভিসন্ধিও।

তৃতীয়ত, পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিশুর মাতৃভাষার মাধ্যমে পঠনপাঠনের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। কারণ তাতে শিশুর শিখতে সুবিধা হবে এবং পড়াশোনার প্রতি ভীতি কাটবে, স্কুলছুট কমবে-- একদম সঠিক, শিক্ষায় মাতৃভাষার জোর থাকলে তা শিশুর সামাজিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাব প্রকাশের সামর্থ্য বিকাশেও বিশেষ সহায়ক হয়। কিন্তু প্রাথমিক স্তরে কেবলই মাতৃভাষা শেখানো হলে, অথচ ষষ্ঠ শ্রেণিতে ওঠা মাত্র ইংরাজিতে প্রাধান্য দেওয়া শুরু হলে তা শিশুর পক্ষে খুবই সমস্যার হয়ে ওঠে। সেই তো ইংরাজির প্রয়োজন হচ্ছে, অথচ গোড়ায় তার পাঠ দেওয়া না হওয়ায় শিশুর মধ্যে একটা ভীতির সঞ্চার হয় পরবর্তী সময়ে। যা তার সার্বিক একটি কুণ্ঠার কারণ হয়ে ওঠে। ইংরাজি-ভীতি কীভাবে বাংলা মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের উপর কাজ করে আমরা সে সম্পর্কে সকলে অবগত। সার্বিক ব্যক্তিত্বে তার ছাপ পড়ে, সে নিজেকে গুটিয়ে নিতে চায়। কেন শিশুর ভাষার বিকাশে মাতৃভাষা শেখার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজি ভাষা শোনা, বোঝা, বা বলার কাজটা প্রথম থেকেই করা হবে না। যেখানে ইংরাজি মাধ্যম বেসরকারি স্কুল দেশে থাকছে, সেখানে পাঠানোর যে প্রবণতা মা বাবার থাকে তা সাধারণত ইংরাজির কারণেই। ভুল শিখুক, ঠিক শিখুক - শুধু ইংরেজিপ্রীতির জন্যই অভিভাবক সেখানে তাদের বাচ্চাদের ভর্তি করছেন। আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় অভিভাবকেরাও চাইছেন তাদের বাচ্চারা ভালো করে ইংরেজি শিখুক। ফলে প্রাথমিক স্তরে ভাষা নিয়ে আরো গুরুত্ব দিয়ে ভাবা দরকার। তা না হলে সরকারি স্কুল শুধু আর্থিকভাবে পিছিয়ে রাখা শ্রেণির জন্য থাকবে।

আরো একটি ক্ষেত্র বেশ দুর্বল ঠেকেছে নীতিটি পড়ার সময়ে— যেমন ক্লাস্টার স্কুলের কথা বলা হচ্ছে.... তিন চারটে স্কুল মিলে একট বড় স্কুল চলবে। শিক্ষার

অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী স্কুল হবে শিশুর বাড়ির একেবারে কাছে, প্রাথমিকের ক্ষেত্রে বাড়ির এক থেকে দেড় কিলোমিটারের মধ্যে আর উচ্চ-প্রাথমিক স্তরে তা হবে বাড়ির দেড় থেকে দুই কিলোমিটারের মধ্যে। ক্লাস্টার স্কুলের ক্ষেত্রে এই ধারা লঙ্ঘিত হবে, অথচ এই ধারার যুক্তিটি অকাট্য, ‘‘লার্নিং উইদাউট বারডেন’’ ধারণা বলেছিল বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব অনেকটা হলে তা কেবল শিশুর পক্ষে পরিশ্রমসাধ্যই নয়, এই ঝকমারি বহুক্ষেত্রে স্কুলছুটের কারণও হয়ে দাঁড়ায়। তাই দূরত্ব কমিয়ে শিশুর শিক্ষাক্ষেত্রে পৌঁছতে পারাকে সুগম করা অবশ্য জরুরি।

নীতিতে বলা হয়েছে বাচ্চাদের কোডিং শেখানোর কথা, পরিকাঠামোর বিপুল উন্নয়ন ছাড়া আমাদের স্কুলের মতো স্কুলে কম্পিউটার-কেন্দ্রিক পড়াশুনা অসম্ভব। পরিকাঠামোর ঢালাও পরিবর্তনের তেমন কোনো উল্লেখ নীতিতে নেই।

বলা হয়েছে প্রয়োজনে স্কুলের কার্যকলাপে এনজিও-র সাহায্য নিতে, সরকারি স্কুলে এভাবে বেসরকারি যেকোনো কিছুকে দরজা হাট করে খুলে দেওয়ার পরিণাম খুব স্বস্তিদায়ক হয় না। এগুলো নিয়ে সুস্পষ্ট আলোচনার দাবি রাখে। একটা বিষয় বেশ স্পষ্ট হচ্ছে যে রাষ্ট্র এই নীতিতে আর্থিক বরাদ্দ বাড়ানোর কথা উল্লেখ করেনি— যাতে করে আমরা কার্যকরী কোনো চর্চা শুরু করতে পারি। এমনকি একটা বিস্তর ফাঁক থেকে যাচ্ছে সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের অস্তিত্ব, পারস্পরিক প্রতিযোগিতা নিয়ে।

এই ফাঁকগুলো ভরাট করে এই শিক্ষানীতি ভারতবর্ষে প্রয়োগ হবে এই আশা রাখছি।

অসংখ্য ধন্যবাদ প্রতীচী ইন্ডিয়া ট্রাস্ট এবং টেক মাহিন্দ্রা ফাউন্ডেশনকে জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ নিয়ে যে আলোচনা সভার উদ্যোগ নিয়েছেন এবং আমি সেখানে আমার ভাবনা তুলে ধরার সুযোগ পেয়েছি, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ।

বিশেষ চাহিদার শিশুকে ভুলি নি

গার্গী ভট্টাচার্য
সারদা বিদ্যাপীঠ (প্রাথমিক)

২০২০ সালের মার্চ মাসের শেষ থেকে অনলাইনে পঠনপাঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। প্রথমে এই ব্যবস্থায় ধাতস্থ হতে বেশ কিছুদিন সময় লাগে। তারপর পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে চলতে থাকে অনলাইন পড়াশুনা। এই ব্যবস্থার সুবিধাগুলির তুলনায় অসুবিধার সংখ্যা অনেক বেশি, বিশেষত শিশুদের ক্ষেত্রে। এই সমস্যাগুলি প্রায়োগিক দিক দিয়ে আরো জটিল ও বহুমাত্রিক হয় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে। যেহেতু বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ক্ষেত্রে শিশু সম্পর্কে শিক্ষকের বোঝাপড়া তৈরি হওয়ার জন্য যে বেসলাইন অ্যাসেসমেন্টটি প্রয়োজন হয়, তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তৈরি, সেজন্য তার গোটা পেডাগগিটিই হয়ে ওঠে অত্যন্ত বিস্তারিত। শিশুর বিকাশের প্রত্যেকটি ক্ষেত্র— অর্থাৎ শারীরিক, বুদ্ধিগত, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক, ভাষাগত ও নৈতিক, খুবই ধরে ধরে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। তারপর সেই অনুযায়ী লক্ষ্য স্থির করা, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুটির সামর্থ্য ও দুর্বল জায়গাগুলি খুঁজে বার করা, পাঠ পরিকল্পনা করা, শিক্ষণের ধাপ ও কৌশল ঠিক করার কাজগুলি করা হয়। কোনো কিছু শেখার সময় তাই শিশুর ও শিক্ষকের শারীরিক উপস্থিতি এই কাজগুলির ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান শর্ত হয়ে ওঠে। বিশেষত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ক্ষেত্রে অন্যের ভাব বোঝা ও নিজের ভাব প্রকাশ এমন দুটি জটিল ক্ষেত্র যা ডিজিটাল মাধ্যমে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কেবল কথা নয়, একজন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর মুখের ভঙ্গিমা, হাত বা দেহের অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চলনও তার ভাবপ্রকাশের উপায় হতে পারে। এই এতগুলি দিক মাথায় রেখে আজকের আলোচনা।

নিত্যদিনের শ্রেণিকক্ষে, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শারীরিক উপস্থিতির কারণে তার যেসব বিকাশগুলি চোখে পড়ে, ডিজিটালি পড়াশুনার ক্ষেত্রে তাদের সেই বিকাশগুলি অনেকটাই চোখে পড়ে না। ফলত প্রতি মুহূর্তে শিশুর

বিকাশগত অবস্থান আন্দাজ করা কঠিন হয়ে যায়। এই অতিমারি পরিস্থিতি আরো নির্দিষ্টভাবে তা টের পাওয়ালো।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করি আমাদের বিদ্যালয়ের একটি ছাত্রীর কথা যে বর্তমানে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। শিশুটি বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়। তখন সে খুব ভীতু ছিল। সকলের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারত না, নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকত। এছাড়াও সাধারণভাবেই যেকোনো কাজে বা আশপাশে ঘটতে থাকা ঘটনার প্রতি ওর মনোযোগের বেশ অভাব ছিল। প্রাথমিকভাবে বোঝা যাচ্ছিল যে শিশুটির বিশেষ যে চাহিদা তা মূলত সামাজিক, প্রাক্ষোভিক, ভাববিনিময়গত ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে, এমনকী বেশ কিছুটা বুদ্ধিগতও বটে। ফলত মেয়েটিকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, মেয়েটির সামাজিক বিকাশ ও তার মনোযোগ বাড়ানোর জন্য আমাদের প্রাথমিকভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে। একেবারে শুরুতে বোর্ড দেখে কিছু লেখার জন্য ওর সাহায্য লাগত, নিজে পেরে উঠত না। বেশ কিছু রোজকার কাজেও বিশেষ সাহায্য লাগত, তাই ওর বন্ধুরাই প্রয়োজনীয় বই, খাতা বের করে দিত। কিন্তু ধীরে ধীরে মেয়েটির মধ্যে এই কাজগুলি করার অভ্যাস ও স্ব-ক্ষমতা তৈরি হতে থাকল। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল ওর বন্ধুরা, কেবল শিক্ষকেরা নন। কারণ মেয়েটি রোজকারের কাজগুলি অন্য বন্ধুদের করতে দেখার সুযোগ পাচ্ছিল, কেবলই শিক্ষকের নির্দেশে সে শিখছিল না। ওর আশপাশে সকলকে যা যা করতে দেখছিল, সেইগুলি অনুসরণ করে করার অভ্যাস তৈরি হচ্ছিল। অনেক শিশুর সঙ্গে থাকতে থাকতে ওর মধ্যে সমানুভূতি, সহযোগিতার মানে বোঝার ক্ষমতা তৈরি হতে থাকে, একইসঙ্গে ওর গুটিয়ে থাকার যে ধারা ছিল, তা কাটতে থাকে। আচরণের পরিবর্তন শিশুটির নিজের পঠন পাঠনেও সাহায্য করে। আগে নিজেকে গুটিয়ে রাখার জন্য, নিজের মধ্যে মগ্ন থাকার জন্য এবং মনোযোগের গুরুতর অভাবের জন্য অন্যের যে কথাগুলি শুনে বোঝার ক্ষেত্রে নানা বাধা তৈরি হচ্ছিল, আচরণের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই বাধাগুলি কাটতে থাকে, ফলে ওর শেখার পথ সহজ হতে থাকে। তবে এই সবটাই সম্ভব হচ্ছিল শ্রেণিকক্ষে। সামাজিক বিকাশে সাহায্য করার ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষে শারীরিক উপস্থিতি অবশ্য প্রয়োজনীয়।

এরপর আসে অতিমারি ও লকডাউন পর্যায়।

এই ক-মাসে মেয়েটির কী কী বিকাশ হয়েছে এবং আমরা এই ৭মাস কীভাবে ওর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ওর পঠনপাঠনে সহায়তা করে উঠতে পেরেছি তা নিয়ে কিছু কথা বলি। বাংলা ও ইংরাজি দুটি ভাষাতেই যখন ও কিছু লিখত, তখন হাতের লেখায় সামঞ্জস্যের অভাব থাকত। কিন্তু ধীরে ধীরে, বিশেষত এই সময় যখন আমরা ওকে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে কিছু লিখে পাঠাতে বলি, তখন দেখা গেছে, ওর হাতের লেখায় আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। খুব সুন্দরভাবে লাইনের মধ্যে ও এখন লিখতে পারে। ওর হাতের ফাইন মোটরের বিকাশ চোখে পড়ার মতো। গল্পপাঠের ক্ষেত্রে যখন বলা হয় যে, বাংলা ও ইংরাজি যেকোনো একটি গল্প পড়ে কী বুঝলে তা নিজের ভাষায় ভিডিও-তে বলে পাঠাও, তখনও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং ভাবের আদানপ্রদান করে। ওর ক্ষেত্রে ভাবের আদানপ্রদানের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ও সঠিকভাবে নিজের ভাবপ্রকাশ না করলে সমাজে সুস্থভাবে, নিরাপদ অবস্থায় বাস করতে পারবে না। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের সঠিক সময়ে নিজের প্রয়োজনের কথা স্পষ্ট করে জানানো খুব জরুরি।

আমরা বিভিন্ন রকম হাতের কাজও দিয়ে থাকি। এবারের বিষয় ছিল গাছের পাতা দিয়ে নিজের ইচ্ছামতো কিছু বানিয়ে পাঠানো। ওই মেয়েটি বিভিন্ন গাছের পাতা দিয়ে একটি ময়ূর বানিয়েছিল। এর থেকে বোঝা যায় মেয়েটির মধ্যে সৃজনশীলতা ও নিজের কল্পনাশক্তিকে বাস্তব রূপ দেওয়ার ক্ষমতার

গাছের পাতা জোগাড় করে বাচ্চারা বানাল মাছ, পাখি

বিকাশ ঘটছে। যা কিছু শিখছে তা ওর জীবনের নানা কাজে সময়ে সময়ে প্রতিফলিত হচ্ছে। সামাজিক বিকাশের যে বিশেষ চাহিদা ওর ছিল তাও নানাভাবে মিটছিল।

সবকিছুর পরও যেটা পারিনি তা হল বাচ্চাটির আচরণগত বিকাশ নিয়ে কাজ করতে। এই কাজটি অনলাইনে করা অসম্ভব। এর জন্য যে সান্নিধ্যের প্রয়োজন, তাতে শিশু ও শিক্ষকের শারীরিক উপস্থিতি জরুরি। আচরণে কোনো সমস্যা তৈরি হলে খুঁজে বার করতে হয় তার কারণ বা সূত্র বা উৎসমুখ। অনলাইনে এই খুঁজে বার করার কাজটি করে ওঠা যাবে না। ফলে অগ্রহণযোগ্য আচরণ ও তার ফলাফলের পরিবর্তন ঘটানোও সম্ভব হবে না। তবে মেয়েটির বাড়ির বড়রাও যথেষ্ট সচেতন এবং নিষ্ঠার সঙ্গে ওর ব্যাপারে সহযোগিতা করে।

এই ৭মাস লকডাউন পর্যায়ে বাচ্চাদের আনন্দদানের জন্য আমরা অনলাইনে কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম। তাতে প্রথম এই মেয়েটি কবিতা পাঠ করে শোনায়। ওর থেকে উৎসাহিত হয়ে বাকিরা নাচ, গান ও কবিতা পাঠাতে থাকে। শুধু তাই নয়, বাচ্চাদের শারীরিক দিক থেকে সুস্থ রাখার জন্য যোগব্যায়ামসহ নানাবিধ ব্যায়াম, স্বাস্থ্যবিধির গান অভ্যাস করাই ডিজিটালি। এগুলিতেও মেয়েটি সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। তাতে বোঝা যায় তার দলগত কাজে যোগদানের ক্ষমতা তৈরি হয়েছে, বেড়েছে।

অনলাইন ক্লাসরুম কখনই বাস্তবের রক্ত মাংসের মানুষ নিয়ে ভরা ক্লাসরুমের বিকল্প হতে পারে না। সে কেবল এজন্য নয় যে বেশিরভাগ বাচ্চাই এটি ব্যবহার করার মতো আর্থ-সামাজিক অবস্থানে নেই। এর অন্যতম কারণ এও যে, সার্বিক বিকাশ কেবল তত্ত্বগত বিষয় না। সরাসরি মানুষে মানুষে যোগ না হলে সব বিকাশই অসমাপ্ত থেকে যায়।

নানা অশান্তির মধ্যে কাটছে আমাদের দিন। স্কুল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকার মতো বিপন্নতা খুব কমই হয়। কাঁচাবয়সের বাচ্চাগুলির অনেকটা সময় বন্ধুহীন হয়ে কাটছে, এ কেবল আমাদের দুশ্চিন্তা নয়। ক্ষুদে পড়ুয়ারা নিত্যদিন ছটফট করছে কবে স্কুলবাড়িটিতে ঢুকবে, দেখা হবে বন্ধুদের আর দিদিমণিদের সঙ্গে। স্কুল খুললে আমাদের প্রথম কাজ হবে বাচ্চাগুলিকে ধাতস্ত করা, সকল বাচ্চার দীর্ঘদিনের স্কুলের অনভ্যাস যত তাড়াতাড়ি কাটাতে পারা যাবে তত তাড়াতাড়ি আমরা ঢুকে যেতে পারব পাঠ্যবইয়ে।

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০: কিছু ভীতিপ্রদ ইশারা

শৈবাল বসু
অরবিন্দ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি

অপ্রত্যাশিত অতিমারি এবং লকডাউনের দিনে ভিটে মাটি ছেড়ে ভিন প্রদেশে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকেরা যখন রাষ্ট্রের নজরদারি এড়িয়ে পায়ে হেঁটে ঘরে ফিরছেন, আমরা আরো অপ্রত্যাশিতভাবেই, সেই ক্ষণে, একটি ‘‘জাতীয় শিক্ষানীতি’’ হাতে পেলাম। প্রত্যাশিত ছিল, একটি জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির, জনস্বাস্থ্য বিষয়ক রাষ্ট্রের ছবিটার ছবি। তবুও, আমরা ৩৪বছর পরে হাতে পাওয়া এই নতুন দলিলটির দিকে তাকালাম, একটি ঘোষিত কল্যাণকামী রাষ্ট্রের নতুন শিক্ষানীতির বয়ানের দিকে চেয়ে দেখলাম, প্রত্যাশা আর সংশয়ের মেলামেশাঘন দৃষ্টি নিয়ে।

বয়ানের ভাষাটি মূলতঃ বেশ একাডেমিক। আধুনিক এবং উত্তর আধুনিক প্রান্ত-কেন্দ্র বিরোধের ইশারা, পড়ুয়া কেন্দ্রিক ক্ষমতা বন্টনের সম্ভাবনার আলো, শিক্ষাব্যবস্থা থেকে একাডেমিক আধিপত্যবাদের তীব্রতা কমিয়ে আনার প্রস্তাব--- সব কিছু আছে এতে। আছে শিক্ষা একটি জাতীয় দায়িত্ব (a public affair) এই ঘোষণা, আছে পুঁথি-পড়া পাশমুখি ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা, আছে বৃত্তিনির্ধারক শিখন ব্যবস্থার নানা প্রস্তাব। এসব কিছু, নীতিগত দিক থেকে, আশা জাগায়। আশা জাগায় আন্তঃ বিষয় বিদ্যাচর্চার পরিসর তৈরির প্রস্তাব। আশা জাগায় শেখার বিষয়বস্তুর পাশাপাশি শেখার পদ্ধতি নিয়ে কিছু আধুনিক ভাবনার উল্লেখ।

জাতীয় শিক্ষানীতির এই অবিসংবাদিত শুভ ভাবনাগুলি এবং স্কুলশিক্ষার পুনর্বিন্যাসের ভাবনাগুলি নিয়ে ইতিমধ্যে অনেক কথোপকথন হয়েছে। সেগুলির পুনরুল্লেখ করছি না আমার আলোচনায়। আমি এই শিক্ষানীতির আপাত উজ্জ্বল নিটোল গড়নের ফাঁকফোঁকরে বেশ কিছু ভীতিপ্রদ ইশারার দিকে চোখ মেলে দেখতে চাই। তিনের পাতার শেষ বাক্যটিতে যে ‘‘ভারতীয়

ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ" (India's traditions and value systems) এর কথা বলা হয়েছে সেখানে ''India" বলতে যদি একমাত্রিক (monolithic) হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভারত (যে ভারতের সম্ভাব্য চিত্র কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশ্রয়ে কেবল সামনে তুলে ধরা হচ্ছে) বোঝায়, তাহলে এতো বড় একটা দেশের নানা ভাষা নানা মত এই বিবিধের নিজস্ব স্বরের ওপরে একটা কল্পিত একক জাতীয়তার আধিপত্য চাপিয়ে দেবার অশুভ সম্ভাবনা থেকে যায়। আর সেই সম্ভাবনা গাঢ়তর হয় এই শিক্ষানীতির ছাপা বয়ানের পাতায় পাতায় মুদ্রিত কিছু শব্দের উচ্চারে। ছয় পাতায় ''The vision of the Policy" তে ভারতকে একটি ''Global Knowledge Superpower"-এ ''উন্নীত" করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। ''ক্ষমতার" সঙ্গে, এবং প্রভুত্বের সঙ্গে সংলগ্ন এই ''Superpower" শব্দটি এতই আধিপত্যগন্ধী (hegemonic) যে ভারতবর্ষের চিরকালীন সারস্বত সাধনার উদার বাণীর সঙ্গে তার একটি বিরোধ রচিত হয়। যে ভারতীয়ত্বের গরিমা পড়ুয়ার ভেতরে গেঁথে দেবার কথা বলা হল, সাম্প্রতিক ভারতের নিরন্তর সাংস্কৃতিক অবনির্মাণগুলি দেখে একে 'ভারতীয়ত্ব' বললে ভ্রম হবে, যে জাতীয়বাদকে রবীন্দ্রনাথ সভ্যতার সংকটরূপে চিহ্নিত করেছেন। সে এক আগ্রাসী, অসহিষ্ণু উগ্র ভারতীয়ত্ব। ১৪ পাতায় ভাষার বিষয়ে আবার আমরা ''এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত" নামের শ্লোগান পাই, পাই সূক্ষ্ম Superlative-এর ব্যবহার। শিক্ষাবিদ হিসেবে উদার রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত হন না, উদ্ধৃত হন স্ব-বিরোধে পূর্ণ, মানবীচিন্তায় প্রায় পিতৃতান্ত্রিক বিবেকানন্দ। (১২ পাতায় ৪/৪, ৬ নম্বর লাইন) যদি ফিরে তাকাই প্রাচীন ভারতের যে সব চিন্তকদের নাম এই বয়ানে উচ্চারিত সেই তালিকায়, (পৃষ্ঠা-৮) আমরা পাব বরাহমিহিরের নাম, পুরাকথা অনুসারে তিনি খনার জিভটি কেটে দিয়েছিলেন। কবীর, নানক বা শ্রীচৈতন্যের নাম পাব না আমরা, কারণ এরা ''সনাতন" হিন্দুত্বের বাইরে প্রান্তিক মানুষের কথা ভেবেছিলেন, ব্যক্তিপূজক না হয়ে মানবপ্রেমকে ধর্ম বলে স্বীকার করেছিলেন।

বয়ানের ১৬ পাতায় নীতিশিক্ষার কথা, ''নিষ্কাম" কর্মের কথা, বলা হয়েছে--- সরাসরি হিন্দু ধর্মশাস্ত্র থেকে উল্লেখ এটি। (৪/২৮) শিশুপাঠ্য গল্প হিসেবে সুপারিশ করা হয়েছে পঞ্চতন্ত্র, জাতক ও হিতোপদেশ। যে সমস্ত টেক্সট সংস্কৃত বা পালিতে লেখা যে সব টেক্সটই যেন আন্তর্জাতিক সুপারপাওয়ার হয়ে উঠতে হলে পড়তে হবে নব্য ভারতের। একাধিকবার পড়ুয়াদের ভাবীকালের সুনাগরিক করে তোলার জন্য সংবিধান নির্দেশিত দায়িত্ব

(duties) গুলির উল্লেখ রয়েছে এই শিক্ষানীতিতে কিন্তু কোথাও বলা হয় নি পড়ুয়ারা জানবে তাদের নাগরিক ও মানবিক অধিকারের কথা আর সাংবিধানিক মৌলিক অধিকারের কথা। যে ভারতে আমসংখ্যালঘু মানুষের হেঁসেলে উগ্র হিন্দুত্ববাদের সহিংস নজরদারি চালু হয়েছে, সেখানে প্রতি নাগরিকের ধর্মাচরণের অধিকারের বার্তা জানানোর সুপারিশ ঘুণাক্ষরেও উঠে আসে না এই শিক্ষানীতিতে। যেমন আসে না সংবিধানের প্রস্তাবনার ''ধর্মনিরপেক্ষ'' শব্দটি, যে শব্দ বিগত ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতির শুরুতেই উচ্চারিত হয়।

ভারতীয় ঐতিহ্যের যে নব্য সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নির্মাণের অভ্যাস প্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলেছে সাম্প্রতিক কালে যেখানে ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে প্রাচীন বৈদিক ও পৌরাণিক সংস্কৃতির প্রতি কেন্দ্রিক গুরুত্ব আরোপিত হচ্ছে। তাই শিক্ষানীতিতে পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশের পাশাপাশি উঠে আসে না বাইবেলের গাথাগুলি, আসে না সুফীবাউল, ফকির, মুরশেদ, বৈষ্ণব সহজিয়া সাধক ও দার্শনিকদের মৌলবাদবিরোধী উদার মানবিক জীবনদর্শনের কথাগুলি। হয়ত, পরিকল্পিতভাবেই আসে না।

শিশুর বিনাব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ এদেশের সকল শিশুকে পড়বার অধিকার দিয়েছিল। এই শিক্ষানীতিতে প্রাক-প্রাথমিক স্তরেও সকল শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থার আওতায় আনার কথা বলা হয়েছে। সেই অতি কোমল মানসিক ও শারীরিক গড়নের শিশুকে বিদ্যালয়ের উঠোনে সানন্দ নিমন্ত্রণ জানাতে বর্তমান অঙ্গনওয়ারী কর্মীদল নিছক অনলাইন প্রশিক্ষণ পেয়ে কিভাবে রাতারাতি প্রস্তুত হয়ে উঠবেন তা নিয়ে গহীন সংশয় জাগে। আরো উৎকণ্ঠা হয় সদ্য কিশোর বা বালক-বালিকাকে হাতে কলমে বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেবার কথা শুনলে। এই লকডাউনে উপার্জনহারা কত শ্রমিক পরিবারের শিশুরা বাবা মায়ের সাথে সবজি বেচতে পথে বেরিয়ে এল, তারা কি আর ফিরে আসবে ইস্কুলের আঙিনায়, যে শিক্ষানীতিতে দেশব্যাপী আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের কথা, উন্নততম পরিকাঠামোর কথা বলা হয় সে দেশের সরকার কি তার অর্থনীতিতে এর যথোচিত সমর্থন রাখেন?

এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে সমগ্র শিক্ষা মিশনে বাজেট কমেছে ৭৭০০কোটি। অঙ্গনওয়ারি ও শিশুপুষ্টির বরাদ্দ কমেছে চার হাজার কোটি। ২০২০-২১ সালের বাজেটে কিশোরী কন্যাদের প্রকল্পে বরাদ্দ ছিল ২৫০ কোটি। খরচ

হয়েছে ৫০ কোটি। এই হল বাস্তব চিত্র। সর্ব অর্থেই এই শিক্ষানীতিকে তাই সোনার পাথরবাটি ছাড়া আর কিছুই বলব না।